দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৩ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।। ১১ জানুয়ারি ২০২১।। ২৬ পৌষ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

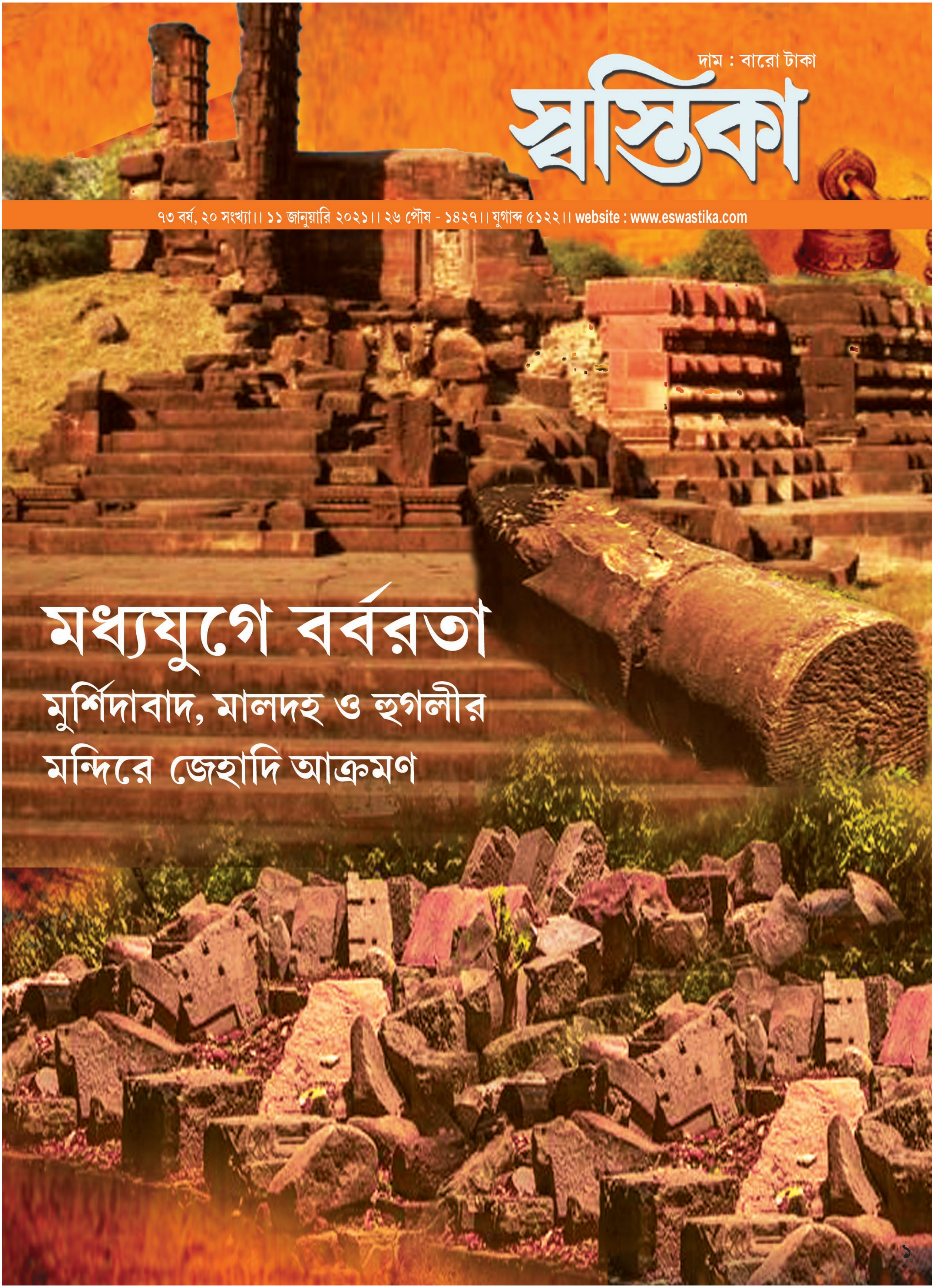

মধ্যযুগে বর্বরতা

মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও হুগলীর মন্দিরে জেহাদি আক্রমণ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ২৬ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১১ জানুয়ারি - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

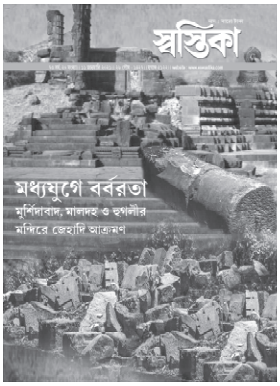

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে জমি আত্মসাৎ করার অভিযোগ
□ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ৬

মৌলবাদী শক্তিকে প্ররোচিত করতেই মিমকে ব্যবহার করছে কমিউনিস্টরা □ বিশ্বামিত্র □ ৭

খেলনা নির্মাণ শিল্পে ভারত লিডার হয়ে উঠতে পারে
□ গণেশ পুথুর □ ৮

নয়া শিক্ষানীতি যুগের দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ
□ ড. গৌতম মুখোপাধ্যায় □ ১১

বড়দিনকে হিন্দুয়ানায় বেঁধেছিলেন স্বামীজী
□ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ১৩

মূল্যবোধের সংকটে বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথই আদর্শ
□ ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ □ ১৫

খেলার মাঠে স্বামী বিবেকানন্দ □ স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ □ ১৭

ফিরোজ মিনারে এখনও তীর্থযাত্রীরা প্রদীপ জ্বালান
□ তরুণ কুমার পণ্ডিত □ ২৩

মুর্শিদাবাদের দেবদেউল ও কাটরা মসজিদের ইতিকথা
□ বিনয়ভূষণ দাশ □ ২৬

একটি শাশ্বত চিন্তন ও মুক্তির দূত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী
□ সৌমিত্র সেন □ ৩১

বঙ্গ-রমণীদের অতি জনপ্রিয় ব্রত 'ইতু'
□ স্বপন দাশগুপ্ত □ ৩৩

সাভারকরকে বীর উপাধি দিয়েছিলেন স্বয়ং ইন্দিরা
□ ডা: আর এন দাস □ ৩৫

সঙ্ঘের আদর্শ সেবার পথে আত্মবিসর্জন
□ ডা: আশিস গৌতম □ ৩৮

একে একে নিভিছে দেউটি□ রামানুজ গোস্বামী □ ৪৩

আলেম-ওলেমাদের ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নতুন বছরে পা দিল□ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **ভাবনাচিন্তা : ২০** □

রঙ্গম : ২১ □ **সুস্বাস্থ্য : ২২** □ **খেলা : ৩৯** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **চিত্রকথা : ৪২**□ **শব্দরূপ : ৫০**

প্রকাশিত হবে
১৮ জানুয়ারি
২০২১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় রাজনীতির ‘অভিমন্যু’

প্রকাশিত হবে
১৮ জানুয়ারি
২০২১

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অবদান নিয়ে নানারকম আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এইসব গ্রন্থে বাম এবং কংগ্রেসি তাত্ত্বিকরা সাধারণভাবে গান্ধী-নেহরু মডেলের অনুসরণে নেতাজীর ভূমিকা পর্যালোচনা করেছেন। স্বাধীনতার আগে এবং পরে বাম ও কংগ্রেসি শিবির নেতাজীকে কীভাবে অপমান করেছে, ভিত্তিহীন কুৎসা রটিয়ে কতটা রক্তাক্ত করেছে— তার চর্চা খুব একটা হয় না। বস্তুত, গান্ধী-নেহরু এবং কমিউনিস্টদের সম্মিলিত আক্রমণের সামনে একা অসহায় নেতাজীকে মহাভারতের অভিমন্যুর মতো মনে হয়। আগামী সংখ্যায় স্বস্তিকার পাতায় পূরবী রায়, পারুল সিংহ এবং কল্যাণ চক্রবর্তী বিশ্লেষণ করবেন সেই অপমান আর লাঞ্ছনার ইতিহাস।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দুর ইতিহাস সতত সংগ্রামের ইতিহাস

মন্দিরময় ভারতবর্ষ। এই দেশে পাহাড়-পর্বতে, শহরে-গ্রামে-প্রান্তরে মঠ-মন্দিরের ছড়াছড়ি। এই দেশের মানুষের কাছে মঠ-মন্দির শ্রদ্ধার কেন্দ্রস্থল। মঠ-মন্দির কেবল তাহাদের নিটক উপাসনা স্থল নহে, মঠ-মন্দির হইল এক-একটি সংস্কার কেন্দ্র। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে কত সেবাকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র। ভারতবর্ষের মানুষের কাছে মঠ-মন্দির প্রাণের ধন। সাধারণ তীর্থযত্রী তো বটেই, কত অনাথ-আতুর প্রতিদিন কোনো-না-কোনো মন্দির হইতে তাহাদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তিও নিবারণ করিয়া থকেন। ভারতবর্ষের সাধু-মহাত্মাগণ ভারতবর্ষকে একসূত্রে বাঁধিবার জন্য দেশের কোণে কোণে মন্দির তৈরি করিয়াছেন। ভাষা-প্রান্তের বিভেদ ভুলিয়া দেশবাসী মন্দিরে মন্দিরে একাকার হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, মঠ-মন্দিরগুলি সমগ্র বিশ্বের নিকট ভারতবর্ষের পরিচিতি তুলিয়া ধরিয়াছে। ভারতবর্ষকে জানিবার জন্য বিশ্ববাসী ভারতের তীর্থে তীর্থে, মন্দিরে মন্দিরে প্রবাস করিয়া থকেন, তাঁহারা একটু শান্তির সন্ধান করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের শ্রদ্ধাকেন্দ্র, আস্থার স্থল এই মন্দিরের উপর প্রথম আঘাত পড়িল ৭১২ খ্রিস্টাব্দে ইসলামি জেহাদিদের দ্বারা। শুধুমাত্র তরবারির দ্বারা এই দেশের হিন্দুদিগকে ইসলামে পরিবর্তিত করিতে না পারিয়া সেই দস্যুরা হিন্দুর মেরুদণ্ড ভাঙিবার জন্য মন্দিরে মন্দিরে, শিক্ষাকেন্দ্রে আঘাত হানিল। ধর্মান্তরিত নব্য ইসলামিরাও মন্দির ধ্বংসে মাতিয়া উঠিল। তাহারা ভারতবর্ষের হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই মালমশলা দ্বারা মসজিদ ও মাজার তৈরি করিল। এইভাবে শত শত বৎসর ধরিয়া কত লক্ষ মঠ-মন্দির তাহারা ধ্বংস করিয়াছে তাহার কোনো লেখাজোখা নাই। ঐতিহাসিকগণ শহরে-নগরের বিখ্যাত বিখ্যাত পাঁচ হাজার মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জের পরিসংখ্যান ইহার মধ্যে নাই। ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে এই ধ্বংসলীলা শুরু হইয়া মোগল আমল পর্যন্ত ইহা চলিয়াছে। আগ্রাসী ইসলামিরা অযোধ্যায় শ্রীরামের মন্দির ধ্বংস করিয়াছে। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, বারাণসীতে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করিয়াছে। আমাদের বঙ্গপ্রদেশও তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাই নাই। মালদহের গৌড়-আদিনা-পাণ্ডুয়া; মুর্শিদাবাদের কাটরা, হুগলী ত্রিবেণীর দরগা ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বস্তুত আগ্রাসী ইসলামের রক্তেই রহিয়াছে পরধর্ম বিদ্বেষ। ইহাকেই তাহারা বেহস্তে যাইবার পথ বলিয়া মনে করে। ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁহার কমলা বক্তৃতামলায় বলিয়াছেন, 'মুসলমানদের ধর্মমতে হিন্দু মন্দির ও দেব-দেবীর মূর্তি ধ্বংস করা, হিন্দুকে মুসলমান করা, হিন্দুরাজ্য দখল করা পবিত্র কার্য। দখল করিলে পুণ্য, না করিলে প্রত্যবায়।"

বলা হইয়া থাকে যে, ইসলামি আমলে অত্যাচারে অত্যাচারে, পদাঘাতে পদাঘাতে হিন্দুর মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। বস্তুত ইহা অর্ধসত্য। আসল সত্য হইল হিন্দুর ইতিহাস সতত সংগ্রামের ইতিহাস। বিধর্মীরা দেবালয় চূর্ণ করিয়াছে, হিন্দুরা পুনরায় নির্মাণ করিয়াছে। তাহার প্রাণের ঠাকুরকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হইলেও প্রতিবাদ করিতে হিন্দুরা কখনোও বিরত হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, অত্যাচারী রাজত্বের অবসান হইয়া দেশ স্বাধীন হইলেও বহু মঠ-মন্দিরের অধিকার হিন্দুরা পায় নাই। ইসলামি আমলের অত্যাচার ও মন্দিরের ধ্বংসসাধন বর্তমান প্রজন্মকে জানিতে দেওয়া হয় না। প্রকৃত ইতিহাস গ্রহণের বাধা ছিল আমাদের সরকারি শিক্ষানীতি। কংগ্রেসি ও মার্কসবাদীদের তৈরি শিক্ষানীতির মূলকথা ছিল, ভারতে তুর্কিদের ভূমিকা 'প্রোগ্রেসিভ'। বড়োই আশার কথা, বর্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের স্বাভিমান জাগ্রত হইবে, জানিতে পারিবে দেশের প্রকৃত ইতিহাস।

সুভাষিতম্

মর্মান্তঃ পরিহাসো যাবৎ ক্রিয়মাণভদ্রকত্বং চ।
স্মরণং চ দুষ্কৃতানাং ত্রীণি কুমিত্রস্য চিহ্নানি।।

মনে কষ্ট দেওয়ার মতো মজা করা, যতক্ষণ লাভ ততক্ষণ ভালো ব্যবহার করা এবং শুধুমাত্র খারাপ কথাই মনে রাখা—এই তিনটি কুমিত্রের লক্ষণ।

অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে জমি আত্মসাৎ করার অভিযোগ

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন বেআইনিভাবে জমি দখল করেছেন বলে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ এনেছেন। এই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ বিদেশে থাকেন, প্রায়শ ভারতভূমিতে পদার্পণ করেই তিনি হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। নিয়মিতভাবে দেখা যায় তিনি বামপন্থা, বামনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গের ৩৪ বছরের বামজমানার হয়ে ওকালতি করেন। তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেআইনি দখলদার রূপে অভিযুক্ত কর্তৃক বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চিঠি লিখেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ডজন ডজন বেআইনি দখলদার আছেন, তাদের মধ্যে পড়েন নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূসম্পত্তি দপ্তর সম্প্রতি বেআইনি দখলদারদের একটা তালিকা প্রস্তুত করেছে যাঁরা গোড়ায় বিশ্বভারতী প্রশাসন তাদের যে জমি বণ্টন করেছিল তার চেয়ে বেশি জমি দখল করে বসে আছেন। অমর্ত্য সেন তাঁর মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেনকে যে ১২৫ ডেসিমেল জমি বণ্টন করা হয়েছিল তার চেয়ে ১৩ ডেসিমেল জমি দখল করেছেন। বর্তমানে যে প্রতীচী নামে ভবনটি অমর্ত্য সেনের দখলে রয়েছে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত ভাবে সেই ভবনে আসা-যাওয়া করেন।

অমর্ত্য সেন তাঁর বেআইনি দখলদারির অভিযোগের উত্তর না দিয়ে বলেছেন যে, শান্তিনিকেতন সংস্কৃতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সংস্কৃতির মধ্যে বিশাল ফাঁক আছে। শুধুমাত্র এই কারণে যে এই উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেআইনিভাবে তাঁর আত্মসাৎ করাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। 'শান্তিনিকেতনে জন্ম ও বড়ো হওয়ায় আমি শান্তিনিকেতন সংস্কৃতি ও উপাচার্যের সংস্কৃতির মধ্যে বিশাল ফারাকের উপর মন্তব্য করতে সক্ষম, তিনি (উপাচার্য) দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এই সরকার ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে চলেছেন, সেক্ষেত্রে আমি ভারতীয় আইন যা আছে তাই কাজে লাগাব', শ্রী সেন বলেছেন।

তিনি আরও বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আমাদের বলা হচ্ছে যে, উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী শান্তিনিকেতন প্রাঙ্গণে লিজ জমির বেআইনি দখলদারি উৎখাত করতে দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং আমি ওই দখলদারদের তালিকাভুক্তদের অন্তর্গত হয়েছি। যদিও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কখনো আমাদের কাছে আমাদের জমির অনিয়মের কোনো অভিযোগ আনেননি। বিশ্বভারতীর যে জমিতে আমাদের বাড়ি রয়েছে সেটা একটা দীর্ঘমেয়াদি লিজে দেওয়া আছে আর সেটা শেষ হতে ঢের দেরি আছে। আমার বাবা কিছু জমি স্বাধীনভাবে কিনেছিলেন এবং মৌজা সুরুলে জমির পরচায় নথিভুক্ত আছে। বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা ও হার্ভার্ডে অর্থনীতির অধ্যাপক সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি আত্মসাৎ করার বিষয়ে তদন্তের দাবি করেছেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি আত্মসাতের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের হাতে ধরা পড়ে অমর্ত্য সেন এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে তাঁর অবস্থান ব্যাখ্যা না করে উপাচার্য সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছেন। সেন মহাশয় এমনকী এটাও দাবি করেছেন যে জমি তাঁর বাবার নামে বণ্টন করা হয়েছিল তা তাঁর নামে স্থানান্তরিত করা হোক! এর তদন্ত জরুরি', শ্রী স্বামী বলেছেন।

আগেও এমন সংবাদ বেরিয়েছে যে অমর্ত্য সেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসক থাকাকালীন ঘোর দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন। টাইমস অব ইন্ডিয়ার সংবাদদাতা ভারতী জৈন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মে ও তহবিল খরচ করার ভয়াবহ দাবি করেছেন। তিনি টুইটে অভিযোগ করেছেন, 'অমর্ত্য সেন মনমোহন সিংহের মেজ মেয়ে ও ছোটো মেয়ে দমন সিংহ ও অমৃত সিংহকে সাম্মানিক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরা থাকতেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। কোনোদিনই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কেন ভারতেই আসেননি অথচ তাঁরা নিয়মিত উচ্চ বেতন নিতেন।' বিতর্ক শুধু মাত্র প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং অমর্ত্য সেনের পরিবারের সদস্যদের নিয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ক্যাগের অডিট রিপোর্টে কয়েকজন ব্যক্তিকে আস্তানা গাড়া ও পাকাপাকিভাবে সুবিধার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রেই অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত করা প্রয়োজন। মনে হয় যে এই পণ্ডিত মানুষটি বাম-উদারপন্থী বিদ্বজ্জনের মধ্যে অগাধ সম্মানজক ধারণাকে ব্যবহার করে সরকারি জমি ও জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। □

মৌলবাদী শক্তিকে প্ররোচিত করতেই মিমকে ব্যবহার করছে কমিউনিস্টরা

বিশ্বামিত্র

হায়দরাবাদ-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল মিম পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে শোনা যাচ্ছে। গত ৩ জানুয়ারি মিমের সর্বময় কর্তা আসাদুদ্দিন ওয়েসি ফুরফুরা শরিফের সচিব আব্বাসউদ্দিন সিদ্দিকীর সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁর পথ-নির্দেশ অনুযায়ী মিম পরিচালিত হবে বলে কথা দিয়ে এসেছেন। রাজ্য-রাজনীতিতে এই ঘটনা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে চলেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু তারও আগে এই ঘটনায় রাজ্য-রাজনীতির গতিপ্রকৃতি টের পাওয়া যায়। মিম একটা আঞ্চলিক দল, তাও ২০১৪-য় তেলেঙ্গানা বিধানসভায় সাতটা আসন জেতার পর নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আঞ্চলিক দলের স্বীকৃতি-প্রাপ্তি। তার আগে হায়দরাবাদ লোকসভা আসনে অবশ্য ১৯৮৪ থেকেই জিতে আসছে মিম। বর্তমানে তাদের লোকসভায় সদস্য সংখ্যা দুই। কিছু বিধানসভায় যেমন মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, অতি সম্প্রতি বিহার বিধানসভা নির্বাচনে তারা খাতা খুলেছে। কিন্তু কোথাও নির্ণায়ক শক্তি হওয়ার বিন্দুমাত্রও যোগ্যতাও তারা অর্জন করতে পারেনি।

এখন প্রশ্ন, এরকম একটি রাজনৈতিক দলের কী গুরুত্ব থাকতে পারে। এর উত্তরে বলতে হয়, মিম যে ধরনের রাজনীতি করে সেই রাজনীতি দেশের অখণ্ডতা, দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতিই মিমের রাজনৈতিক সম্বল, হায়দরাবাদের নিজামের রাজত্ব সারা ভারতে লাগু করতে চায় তারা। পশ্চিমবঙ্গে ধরে নেওয়া হচ্ছে, উর্দুভাষী মুসলমানদের মধ্যে মিম প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উর্দুভাষী মুসলমানদের ভোট যদি তারা পেয়ে যায়, তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে তৃণমূলের কপালে দুঃখ আছে। উর্দু-বাঙ্গালি নির্বিশেষে মুসলমান ভোট তৃণমূলের বাক্সে পড়াই রেওয়াজ। সেই রেওয়াজের ব্যতিক্রমের সম্ভাবনায় তৃণমূল নেতৃত্ব প্রমাদ গুণবেন এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এর ফলে আরও একটা যে অতি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

একটা কথা সুকৌশলে তৃণমূল-পন্থী বাম-তাত্ত্বিকরা রটিয়ে দিচ্ছেন। মিম নাকি তৃণমূলের ভোট (পড়ুন মুসলিম ভোট) কেটে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেবে। উদাহরণ হিসেবে বলা হচ্ছে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের কথা, যেখানে মিম পাঁচটি আসনে জেতা ছাড়াও বেশ কিছু আসনে আরজেডি-কংগ্রেসের ভোট কেটে নাকি হারিয়ে দেয়। অর্থাৎ কোনও আসনে আরজেডি-কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে মিমের ভোট যোগ করলে তা বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের থেকে বেশি হতো। এই প্রসঙ্গে বিজেপিও বলতে পারে চিরাগ পাসোয়ানের দলও অনেক আসনে এনডিএ প্রার্থীর ভোট কেটেছে। বিজেপি-জেডিইউর জোটে চিরাগের লোক-জনশক্তি পার্টি থাকলে এনডিএ-র আসন সংখ্যা যে আরও বাড়ত এটা পাটীগণিতের হিসেবেই প্রমাণ করা যায়। পাশাপাশি এটা বোঝা দরকার, মানুষের রায় সবসময় পাটীগণিতের বিচারে চলে না। যেমন পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-সিপিএমের জোট তেলে-জলে মিশ খায়নি, পাটীগণিতের কোনও হিসাবই মেলেনি। তাই মানুষের রায়ে এই জোট মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

আসলে মিম-বিজেপি তলে তলে হাত মেলানোর গল্পটা তৃণমূলের বাম-তাত্ত্বিকদের মাথা থেকে বেরিয়েছে। স্বাধীনতার পরে বামপন্থীরা বুঝেছিল, ভারতে মুসলিম লিগের সঙ্গে তাদের আঁতাত প্রকাশ্যে দেখালে দেশভাগের ভিকটিম হিন্দুরা তাদের ছেড়ে কথা বলবে না। তাই সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের পক্ষে সহানুভূতি জোগাতে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা, সংখ্যালঘুদের অধিকার, এইসব শব্দবন্ধনীর আবিষ্কার হলো; মোদ্দাকথা ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানরা কত দুঃখে আছে, অতএব তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটা কত প্রয়োজনীয়, সেই তত্ত্ব প্রচারিত হলো। কমিউনিস্টরা খুব ভালো করেই জানত, ভোটবাক্সে বহুদল-বিভক্ত হিন্দুসমাজের বিপরীতে মুসলমান ভোট এককাট্টা করতে পারলেই এখানে শাসনযন্ত্র কায়েম করা যাবে। সেভাবেই তারা চৌত্রিশ বছর পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করেছে। তৃণমূলও সেই পথে হেঁটেছে। কিন্তু সময় বদলানোর পথে বামপন্থীদের দুরভিসন্ধিও আর সাধারণ মানুষের অগোচরে নেই। বামপন্থীদের এই কৌশল ধার করে চলা ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির অপরিণামদর্শিতায় আজ হিন্দুরা একজোট হয়েছেন, পক্ষান্তরে মুসলমানদের ভোট-বিভাজনের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এতে প্রমাদ গুনছেন তৃণমূলি বামপন্থীরা। কারণ তাঁদের রাজনৈতিক পূর্বসূরিদের এতদিনের সযত্ন লালিত মিথ্যাচার তাসের ঘরে পর্যবসিত হলো বলে। কী আশ্চর্য সমাপতন দেখুন, যে হিন্দু-নিধনকারী টিপু সুলতানকে 'স্বাধীনতা-সংগ্রামী' সাজানোর চেষ্টা হচ্ছিল, সেই টিপুর পতনের পরই দ্বিতীয় নিজাম, মীর নিজাম আলি খান ইস্ট ইন্ডিয়া সাম্রাজ্যে যোগদান করেন। সুতরাং নিজাম- সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখা মিমের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার কথা কমিউনিস্টদের। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অবস্থাটা তাদের চেয়ে ভালো আর কেই বা বোঝে! নরেন্দ্র মোদী আসার পর সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়েছে কমিউনিস্টদের দীর্ঘদিনের হিন্দু-বিরোধী অ্যাজেন্ডা। তৃণমূলকে ঢাল করে বিজেপি-মিম আঁতাতের গল্পটা সেই কারণেই বাজারে ছাড়া হয়েছে, একদিকে বিজেপির রাজনীতিকে 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' আখ্যা দেওয়া, তা যে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার সমতুল তা প্রমাণ করার মাধ্যমে মুসলমানদের পক্ষে ভারতের জনগণের সহানুভূতি আবার ফিরিয়ে আনা, ভোটের লাভ ওঠানো; অন্যদিকে মৌলবাদী শক্তিকে মদত দিয়ে দেশের সর্বনাশ করা এটাই এখন কমিউনিস্টদের একমাত্র লক্ষ্য। সম্প্রতি প্রেস কনফারেন্সে সীতারাম ইয়েচুরি এ বিষয়ে খোলসা করেছেন। বলেছেন, মিমের সঙ্গে বামফ্রন্টের জোট করতে কোনো আপত্তি নেই।□

খেলনা নির্মাণ শিল্পে ভারত লিডার হয়ে উঠতে পারে

গণেশ পুথুর

মোদী সরকার আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে বিশ্বে নির্মাণসংস্থা দেশ রূপে আত্মপ্রকাশের জন্য একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেছে। আমাদের খেলনা শিল্পকেও সর্বতোভাবে বিশ্বজুড়ে আধিপত্য করার উদ্দেশ্য রূপায়ণও আর্থিক বিকাশের এক সময়ানুগ সিদ্ধান্ত।

কোভিড-১৯ জনিত মহামারী এবং চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষ ভারতকে বিভিন্ন শিল্প উৎপাদনে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার ভাবনাচিন্তা করতে বাধ্য করেছে, যেগুলিতে বর্তমানে চীনের একছত্র আধিপত্য। এই রকমই একটি অবহেলিত সেক্টর হলো 'খেলনা শিল্প', আন্তর্জাতিক বাজারে যা প্রায় সাত লক্ষ কোটি মূল্যের সমতুল্য।

খেলনা শিল্পে সম্ভাব্য প্রস্তুতকারক হিসেবে ভারতের সম্ভাবনাকে বাধামুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর আটষট্টিতম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে ভারতের খেলনা শিল্প নিয়ে তাঁর চিন্তাধারার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। প্রধানমন্ত্রীর 'ভোক্যাল ফর্ লোক্যাল'-এর ডাক এবং 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান আমাদের জনগণকে দেশ ও সমাজের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিতে সচেতন করেছে।

ভারতের খেলনা বাজার আট হাজার কোটি টাকার মতো। এর মধ্যে মাত্র পঁচিশ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে আসে, অবশিষ্ট পঁচাত্তর শতাংশ চীনের উৎপাদিত রপ্তানি দ্রব্য দিয়ে পূরণ হয়। ভারতের খেলনা উৎপাদন সংস্থাগুলির (সংখ্যায় প্রায় চার হাজার) পঁচাত্তর শতাংশ মাইক্রোক্যাটেগোরির, বাইশ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং অবশিষ্ট তিন শতাংশ বৃহৎ শিল্প উৎপাদক। চীনের কারিগরি কুশলতা ভারতীয় উৎপাদন সংস্থাগুলির থেকে উন্নতর। এছাড়া চীনের সরকার লগ্নিকারীদের জন্য 'একক উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম' (Single Window Clearance mechainsm) চালু করেছে এবং এইসব উৎপাদকদের বিশেষ ইনসেনটিভ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করার ফলে আমাদের দেশীয় খেলনাশিল্প প্রায় অবলুপ্তির পথে চলে গেছে। কিন্তু লকডাউনের জেরে এবং ভারত সরকারের আমদানিকৃত খেলনা দ্রব্যের উপর ২০-৬০ শতাংশ আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত এবং এবং একইসঙ্গে 'গুণমান নির্ণয় নীতি' (Qualitz Control Order) চালু হওয়ায় আমাদের এই দেশজ শিল্প ঘুরে দাঁড়ানোর আশা দেখছে। লকডাউনের নিষেধাজ্ঞা শিশুদের জন্য অধিকতর খেলনার চাহিদা তৈরি করেছে। যার জন্য দেশীয় বাজারে খেলনার চাহিদা যেমন বেড়েছে কিন্তু একইসঙ্গে ভারতীয় খেলনা উৎপাদকরা তড়িঘড়ি উৎপাদন বাড়ানোর সমস্যাও অনুভব করছে।

ভারতের জনবিন্যাস (Demography) আমাদের খেলনা শিল্পের বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হেতু। ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশের বয়স পঁচিশ বছরের কম। 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র খেলনা বিষয়েই আলোচনা করে ক্ষান্ত থাকেননি, উপরন্তু মোবাইল, কম্পিউটার গেমস তৈরিতে ভারতীয় ধারণার প্রয়োগের ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে প্রায় সমস্ত ভিডিয়ো গেম পাশ্চাত্য কাঠামো অনুসারে তৈরি করা হয়। ভারত সফ্টওয়ার কারবারের অন্যতম প্রধান হওয়ার জন্য দেশজ খেলাধুলাগুলি অবলম্বন করে এগুলি তৈরি করতে এবং একজন সফ্টওয়ার শক্তি হিসাবে নিজেদের প্রভাব বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের যুবাদেরও প্রভাবিত করতে পারে। IMARC-র রিপোর্ট অনুসারে, ভৌগোলিক বিচারে মহারাষ্ট্র খেলনা শিল্পের সর্ববৃহৎ বাজার। এরপর ক্রমানুসারে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গুজরাট ও দিল্লি। 'গুচ্ছ প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব' এই রাজ্যগুলির খেলনা শিল্পে চাকুরির সংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করতে পারে বিশ্বজুড়ে খেলনার বাজারের বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে।

কোয়ালিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার এক গবেষণা থেকে প্রকাশিত যে ভারতে বিক্রিত সাতষট্টি শতাংশ চীনে প্রস্তুত খেলনা 'ভারতীয় সেফটি স্ট্যান্ডার্ড' পরীক্ষায় অসফল।

প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভরতার ডাকে কর্ণাটক প্রথম রাজ্য যে খেলনা শিল্পে সাড়া দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা ঘোষণা করেছেন যে ভারতের প্রথম খেলনা প্রস্তুতকারী গোষ্ঠী 'কিনহালা' খেলনা সংস্থা কোপ্পালা জেলায় স্থাপন করা হবে। প্রাথমিক ক্ষেত্রে এজন্য চার হাজার কোটি মূলধন লগ্নীকরণ হবে যার ফলে আগামী পাঁচ বছরে চল্লিশ হাজার কর্মসংস্থানের

সম্ভাবনা ঘটবে। একে অনুসরণ করে উত্তরপ্রদেশ সরকার একশো একরের মতো জমি আবণ্টন করেছে। খেলনা নির্মাণের জন্য শহর গড়া হবে। ইতিমধ্যে নব্বইটি সংস্থা এই প্রস্তাবিত শহরে নতুন কারখানা তৈরির জন্য আবেদনও করেছে। সমগ্র প্রকল্পটির আনুমানিক বাজেট কুড়ি হাজার কোটি টাকা। যে রাজ্যটির শিল্পোদ্যোগের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে (Enter preneural history) সেই গুজরাট আগ্রহ প্রকাশ করেছে খেলনা নির্মাণকারী সংস্থার শহর গড়ে তুলতে। আন্তর্জাতিক বিখ্যাত খেলনা প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলি যেমন হাসব্রো, মাত্তেল, সিউমবা টয়স্, নামকো বানদাই,জ্যাকিস প্যাসিফিক ও লেগোদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে নির্মাণকারী হাব গড়ে তোলার জন্য। এই আন্তর্জাতিক ব্রান্ডগুলিকে বলা হয়েছে ০-১৪ বয়েসের জনসংখ্যার দিকে নজর দিতে যারা বিশাল ভারতীয় বাজারের পঁচিশ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের সিভি রাজুর নাম উল্লেখ করেছেন। রাজু ইটিকোপ্পাকা খেলনা প্রস্তুতকারক যা বিশাখাপত্তনমের ইটিকোপ্পাকা গ্রামের দেশি উৎপাদন। এই খেলনাগুলির বৈশিষ্ট্য হলো— যে খেলনাগুলিতে কোনো ধারালো প্রান্ত রাখা হয় না, কাঠ দিয়ে তৈরি, দক্ষতার সঙ্গে পালিশ করা এবং সবদিকই গোলাকার আকারের। প্রধানমন্ত্রী দেশে তৈরি এইপ্রকার খেলনা প্রস্তুতের প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছেন যার সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র থাকছে যা শিশুদের মধ্যে দক্ষতা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কতকগুলি জাতিগত খেলনা প্রস্তুতকারী অঞ্চল হলো— কর্ণাটকের চান্নাপাটনা, ওড়িশার সম্বলপুর, রাজস্থানের উদয়পুর, অন্ধ্রপ্রদেশের কোনডাপাল্লি, উত্তরপ্রদেশের বারাণসী এবং পশ্চিমবঙ্গের কাটোয়া।

একাধিক রিপোর্টে পাওয়া যায় যে চীনে তৈরি খেলনাগুলি দূষিত বস্তু দিয়ে তৈরি। ২০১৯ সালের কোয়ালিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার এক গবেষণা থেকে প্রকাশিত যে ভারতে বিক্রিত সাতষট্টি শতাংশ চীনে প্রস্তুত খেলনা 'ভারতীয় সেফটি স্টান্ডার্ড' পরীক্ষায় অসফল। অন্য এক পরীক্ষায় ইউরোপিয়ান এনভারমেন্টাল ব্যুরোর সমীক্ষায় বিরানব্বই শতাংশ চীনা খেলনাগুলি চূড়ান্তভাবে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সস্তায় নির্মিত এই বস্তুগুলি নিম্নমানের মালমশলা দিয়ে তৈরি যা শিশুদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। সংশ্লিষ্ট অথরিটির ফিটনেস সার্টিফিকেট থেকে জানা গেছে যে, অনেক খেলনাই বিষাক্ত বস্তু দিয়ে তৈরি। ভারতের উচিত আমাদের ঘরোয়া বস্তুর নির্মাণ, যেগুলি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং উৎকৃষ্ট কাঁচমাল দিয়ে তৈরি— যা আন্তর্জাতিক বাজারে চীনে উৎপন্ন বস্তুগুলিকে প্রতিস্থাপিত করতে পারবে। এইসঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জান্তিক মঞ্চে সরকারি স্পনসর এবং সচেতনতা প্রোগ্রাম করা উচিত। তার সঙ্গে চাই, খেলনাশিল্পে ভারতের সম্ভাবনার নিয়মিত বিচার বিশ্লেষণ। এই শিল্প অসংখ্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে এবং এই সঙ্গে বাজারে চীনের প্রভাব হ্রাস করতে পারে। কোভিড-পরবর্তী বিপর্যয়ের জন্য চীনের প্রতি বিশ্বজনমত বিক্ষুব্ধ এবং বহুদেশ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে চীন থেকে তাদের সরবরাহ ব্যবস্থা ভারতে স্থানান্তরিত করার। এশিয়ার শক্তিশালী দেশ এবং চীনের বিকল্প এবং আস্থাশীল দেশ হিসাবে ভারত খেলনা নির্মাণ শিল্পের লিডার হয়ে উঠতে পারে। মোদী সরকার আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে বিশ্বে নির্মাণসংস্থা দেশ রূপে আত্মপ্রকাশের জন্য একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেছে। আমাদের খেলনা শিল্পকেও সর্বতোভাবে বিশ্বজুড়ে আধিপত্য করার উদ্দেশ্য রূপায়ণও আর্থিক বিকাশের এক সময়ানুগ সিদ্ধান্ত।

(লেখক হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত)

শোক সংবাদ

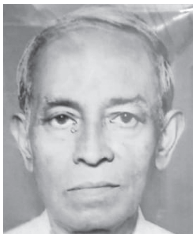

হাওড়া মহানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক কানাইলাল পাড়ুই গত ১৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বালক বয়স থেকে স্বয়ংসেবক কানুদার জীবন আমৃত্যু সঙ্ঘময়। যুবা বয়সে চাকুরি করতে গিয়েও বরোদায় দায়িত্ব নিয়ে সঙ্ঘের কাজ করেছেন। হাওড়ায় নানা দায়িত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে গ্রাহক পঞ্চায়েত ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজেও যুক্ত থেকেছেন। প্রচণ্ড রাজনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজে বাড়িতে রামশিলা পূজন করেছেন, করসেবায় অযোধ্যায়ও গেছেন। সমাজকর্মী হিসেবে শিশুদের নিয়ে 'মণিমুক্তার আসর' গড়েছেন। নাট্যাভিনয় ও সংগীতে সমান পারদর্শী ছিলেন।

****

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ঘনশ্যামজী বেরিওয়াল পরলোক গমন করেছেন। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের কাজের প্রসারে তাঁর অবদান স্বয়ংসেবকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় শ্রীগুরুজী, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী, রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া-সহ বিশিষ্ট কার্যকর্তরা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। শ্রীগুরুজী শেষবারের মতো (১৯৭৩) পশ্চিমবঙ্গে এলে তাঁর বাসভবনেই কলকাতার কার্যকর্তাদের বৈঠক হয়। বিশ শতকের শেষপাদে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘকাজে তাঁর বাসভবন ছিল অন্যতম কেন্দ্র। নম্র স্বভাবের এই প্রবীণ স্বয়ংসেবককে হারিয়ে সঙ্ঘ পরিবারের সকলেই মর্মাহত। ভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

****

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক এবং ইতিহাস পুনর্লিখন সমিতির প্রাক্তন পদাধিকারী মোতিলাল সোনীর গত ১৯ ডিসেম্বর জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে স্ত্রী, তিন কন্যা ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে রেখে গেছেন। তাঁর পুরো পরিবারই সঙ্ঘময়। সঙ্ঘের প্রয়াত প্রচারক অনন্তলাল সোনী ও বংশীলাল সোনী এবং লক্ষ্ণৌয়ের সঙ্ঘচালক সুন্দরলাল সোনীর তিনি অনুজ। বালিগঞ্জ জুট টেকনোলজি থেকে পাশ করে তিনি সুপারভাইজার থেকে জিআইএস-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পর্যন্ত হয়েছিলেন। জুট ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিদেশেও গিয়েছেন। বস্তুত তাঁর সহকর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন 'রোল মডেল'। সহৃদয়, সদাহাস্যময় এই মানুষটির প্রয়াণে সবাই শোকাহত।

ধলাই জেলায় জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের সরকারি, বে-সরকারি নতুন নির্মাণ কাজ সহ সাপ্লাই অর্ডার সরবরাহ করা হয়। জনস্বার্থে জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন নিম্নোক্ত ঠিকানায়—

Govt. Contractor and Order Supplier
Registration - SE/11/758, dt. 23/5/2013
Labour Licence No. AMB/449/C2/2013
Phone : 9436915864
Chandrai Chera, Ambassa,
Dhalai, Pin - 799 289

Advt.

নয়া শিক্ষানীতি যুগের দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ

ড. গৌতম মুখোপাধ্যায়

শিক্ষার সঙ্গে আমরা যারা যুক্ত, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষা নীতি সম্পর্কে কিছু বলার আছে। বাজারি পত্রিকায় অনবরত রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিফলনের প্রেক্ষিতেই একতরফা প্রচার চলছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক বিক্রিত এবং এক নম্বর দাবি করা একটি পত্রিকায় হেড লাইন করা হয়েছে, 'সুবিধাভোগীর কেরিয়ার গড়া হবে, বাকিরা মোট বইবে, শিক্ষা ফিরে এল নামেই'। সমগ্র লেখাটিতে একটিই বিষয় তুলে ধরা হয়েছে তা হলো, 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' নামটি কেন পরিবর্তিত হলো। সমালোচক একবারও স্পষ্ট করে লেখেননি (তাঁরই লেখা শিরোনাম, সুবিধাভোগীর কেরিয়ার গড়া...) কারা বর্তমানে সুবিধা ভোগ করছে, আর কারাই বা আঙুল চুষছে! শুধু লেখক নির্দেশিত হয়েছেন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কিছু ছাইপাঁশ লেখার জন্য! তাছাড়া, এটি কোনো নতুন অনুষঙ্গও নয়। পূর্বে এটি শিক্ষা মন্ত্রকই ছিল। দ্বিতীয় ভাষা? সেখানেও বিশেষ নিবন্ধে 'মোদী সরকারের অভিসন্ধি... বেসরকারিকরণ' এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত টেনেছেন বিশেষ কাউকে ভয় পাওয়া লেখক। ভাবুন, এই হচ্ছে সমালোচনার লেভেল! লেখাটি পড়ে আমি আমার এক ভ্রাতৃপ্রতিম সাংবাদিক বন্ধুকে লিখে জানিয়েছি, পৃথিবীর সব প্রান্তেই নতুন কোনো সংস্কার সাধিত হলে কিছু মানুষ বিতর্ক করার জন্য বিরোধিতা করেন, কিছু মানুষের কায়েমী স্বার্থ বাধা পেলে তারা চিল চিৎকার শুরু করেন আবার রাজনৈতিক অস্তিত্ব জানান দেওয়ার দেউলিয়া প্রচেষ্টায় কেউ মরিয়া হয়ে উঠে প্রাণান্তকর বিরোধিতায় কায়মনোবাক্য হন। কিন্তু বন্ধু, যুগের দাবি মেনে অচলায়তনে প্রাণসঞ্চারের প্রয়োজনে সংস্কার করতেই হয়, এটা ইতিহাসস্বীকৃত। তাছাড়া, সরকার যদি সমগ্র জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছাপূরণে সহানুভূতির সঙ্গে নতুন নীতি প্রণয়ন করেন, তা সমর্থন না করে কূপমণ্ডূকের ন্যায় আচরণ করবেন? সরকার যদি একজন শিশুর সামগ্রিক বিকাশের নীতিগত দায় গ্রহণ করেন, আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মানসিক, বৈচারিক, শারীরিক বিকাশের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সেখানে কার স্বার্থে বাজারি প্রচার মাধ্যমে নেগেটিভিটি ছড়ানো হচ্ছে, মানুষ সেই সত্য খুব তাড়াতাড়ি অনুধাবন করবেন। অতএব, সাধু সাবধান!

দীর্ঘদিন ১০+২+৩ এই অবয়ব ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় চালু ছিল। নয়া শিক্ষানীতি-২০২০-তে তা সংস্কারিত হয়ে ৫+৩+৩+৪ করা হয়েছে। আমার মতো গ্রামের সরকারি শিক্ষায় যারা বড়ো হয়েছি, সকলেই কম-বেশি অবহিত যে, সেই অভিজ্ঞতা সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক ছিল না। আমার মতো অনেক-কেই জোরপূর্বক পাঠশালায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সেখানে না ছিল প্রাণের আরাম, না মিটত মনের খিদে (ক্ষুধা)। রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনি'র সঙ্গে তার হুবহু মিল ছিল। সেই যন্ত্রণা থেকে পরের পর ধাপে একজন-দুইজনের উত্তরণ ঘটলেও সিংহভাগের সলিল সমাধিই অনিবার্য নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যতিক্রম কখনোই বিধানকে সপ্রমাণ করে না। জোর করে পিটুলিগোলা সেবন করানোর বিষ ফল ছিল এই যে, অপরের চশমায় আমরা দেশ-সমাজকে দেখতে বাধ্য হয়েছিলাম। ইতিহাসের পরতে পরতে তার প্রমাণ আছে।

> **ভারতবর্ষকে জগৎসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেতে গেলে শিক্ষানীতির এই অভিগমন খুবই জরুরি। কর্মমুখী যুবসম্প্রদায়ের একবিংশ শতকের দাবিই হলো কর্মসংস্থানের দাবি। সংস্কার ব্যতিরেকে এই অচলায়তনে নতুন প্রাণের সঞ্চার একেবারেই সম্ভব নয়।**

ফ ঃ ২

সে প্রসঙ্গ অন্য কোনোদিন। এরপর নানান চড়াই- উৎরাই পার করে যখন সামাজিক প্রতিষ্ঠা অবশেষে আসে, তখন জীবন থেকে তিনটি সংগ্রামী দশক ফানুসের মতো তিরোহিত হয়ে যায়। সাংসারিক জীবনেও এই অভিজ্ঞতার অন্যথা হয়নি। আমার বংশধরকে তথাকথিত ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তি করলেও পদ্ধতির খুব বেশি রকমফের হয়নি।

উল্টে এদের ব্যাগের ওজন এত বেড়ে গেল যে জীবনের সুকোমল প্রবৃত্তিগুলিই গেল হারিয়ে। এরা 'না হলো ঘর কা' না হলো ঘাট কা'। কেরিয়ারের ইঁদুর দৌড়ে আমরাও তাদের শামিল করছি তাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগাগুলোকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে। ফল তো প্রায়শই আমরা খবরের কাগজ থেকেই পাই। সেই বিয়োগান্তক ঘটনার কথা নাই বা উল্লেখ করলাম! অথচ এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় আমরা সবাই খুঁজছি।

মজার কথা হলো, যখন এই বিষয়ে সংস্কারের উদ্যোগ কেউ একটা নিচ্ছে, তখন রাজনৈতিক দেউলিয়াগ্রস্ত হয়ে গাছের গোড়া কাটার উদ্যোগে উৎসাহী হচ্ছি। যে শিক্ষাবিদগণ বাতিলের দলে, সেই জরাগ্রস্তদের আবার চিমটি কেটে জাগিয়ে তুলছি কালের রথের অভিগমনকে বিপরীতমুখী করে তোলার জন্য। তিন বছর বয়স হলে শিশু যাবে বিদ্যালয়ে। পরবর্তী তিন বছরে বিদ্যালয়ে খেলাধুলার মাধ্যমে সড়গড় হয়ে উঠবে। পরীক্ষা নামক দানবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না। 'আমরা খেলাধুলা করি মহানন্দে'--- এই হবে সূচনার কেন্দ্রবিন্দু। পশু যেমন কষাইকে দেখে, সেই দৃষ্টিতে নবীন কচি-কাঁচার দল শিক্ষককে দেখবে না। শিক্ষার আত্তীকরণের চেয়ে ভালো উদ্যোগ আর কী হতে পারে? কিন্তু না, আমরা পারিনি। অন্যকেও পারতে দেব না। হোক জলাঞ্জলি আমার নবীন নারায়ণদের জীবন। আমি আসুরিক হবই। সঙ্গে তো আছে সেই জরাগ্রস্তরা, যারা টেলিভিশনে দিনের পর দিন বমি করে যাবে!

আশার কথা, আমরা অনেকেই এঁদের গোপন তাসটির হদিশ পেয়ে গেছি। তাই, 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী' মন্ত্রকে পাথেয় করে মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতে দৃঢ়সংকল্প। নয়া শিক্ষানীতি সম্পর্কিত ধারাবাহিক রচনায় আজ তৃতীয় কিস্তিতে এই নীতির রূপকার ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করছি। নতুন শিক্ষা নীতি-২০২০-র রূপকার হলেন প্রখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. কৃষ্ণস্বামী কস্তুরীরঙ্গন। বর্তমানে তিনি রাজস্থানের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও এনআইটিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। তিনি দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়েরও ভূতপূর্ব আচার্য। ভারত সরকার তাঁকে নানান সময়ে বহু উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হন ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে, ১৯৯২-এ পদ্মভূষণ এবং ২০০০-পদ্মবিভূষণ উপাধি লাভ করেন। ৯ বছর তিনি Indian Space Research Organisation-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁরই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধানে INSAT-2, IRS 1A, 1B, IRS-1C, 1D. BHASKAR-1 and 2-র মতো সফল মহাকাশ উৎক্ষেপণ সম্ভবপর হয়েছিল। ষোলটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'Honourary Doctorate' ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে একটুখানি বলতে হলো এই কারণে যে, তিনি কোনো বঙ্গীয় কবিবর, সাহিত্যিক বা বশম্বদ তোষামুদে নন। তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির বছরগুলিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, তিনি কোনো সংকীর্ণ দলীয় ঘেরাটোপে ঘুরঘুর করেন না। তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন মহান শিক্ষাবিদ, যা এই শতককে মহিমান্বিত করেছে। আজ যাঁরা এই শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, ড. কস্তুরীরঙ্গনের ধারেকাছেও কি সেই সমস্ত লোলচর্ম, অশীতিপর, পশ্চাৎমুখী, স্ব-ঘোষিত এবং অনুগৃহীত শিক্ষাবিদ (!)-রা আসতে পারবেন? যাইহোক, নয়া শিক্ষা নীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'This is the time for transformation and drastic changes everywhere. We need to take another look at everything we do. In my view, the first should be education. Transforming and creating a dynamic education system is fundamental for the progress of any country.' নতুন শিক্ষানীতিকে তিনি এইভাবে যুগের দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে বদ্ধপরিকর হন। কেননা, ভারতবর্ষকে জগৎসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেতে গেলে এই অভিগমন খুবই জরুরি। কর্মমুখী যুবসম্প্রদায়ের একবিংশ শতকের দাবিই হলো কর্মসংস্থানের দাবি। সংস্কার ব্যতিরেকে এই অচলায়তনে নতুন প্রাণের সঞ্চার একেবারেই সম্ভব নয়। তাইতো ড. কস্তুরীরঙ্গন মন্তব্য করেছেন, 'In the new world, we must do everything to enrich ourselves. We can not remain short-sighted। ■

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন
আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

বড়দিনকে হিন্দুয়ানায় বেঁধেছিলেন স্বামীজী

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

আপনার মনে কী কখনও প্রশ্ন জেগেছে, একটি খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনেই ভারতবর্ষে 'কল্পতরু' উৎসবের ভাব- আয়োজন কেন হলো? কেন কলোনিয়াল ফেস্টিভ্যালের মেজাজ প্রতিস্পর্ধী হিন্দুত্বের বাতাবরণ নিয়ে ভারতবর্ষীয় উৎসব হয়ে ধরা পড়লো? কেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য হয়ে পয়লা জানুয়ারির মধ্যে হিন্দুয়ানীর ছোঁয়া?

মনে রাখতে হবে, দেশীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করে মেকলে সাহেব ১৯৩৫ সালে যে শিক্ষানীতি প্রচলন করতে চাইলেন, পরের বছরেই তা ভাঙার আয়োজন হলো। —'তোমারে বধিবে যে/গোকুলে বাড়িছে সে।' কলেনিয়াল কৌসল ভাবজগতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য আবির্ভূত হলেন পরুমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। তিনি অপ্রকটের পূর্বে ঔপনিবেশিক ভাবধারাকে পরাজিত করে যাবেন, তা এক প্রকার নিশ্চিত ছিল। তাই দেখা গেল ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের পাতায় জ্বলজ্বল করছে এক অহৈতুকী কৃপালাভের আনন্দঘন দিন। কল্পতরু উৎসব। ভারতবর্ষ আপন সৌকর্যে অতিক্রম করেছে সাম্রাজ্যবাদের চিহ্নমাখা দিনগুলি।

স্বামীজী কী বলেছেন ঘটা করে বড়দিন উৎসব পালনের কথা? এদিন কী আমাদের বাইবেল পাঠ করে যীশুর জন্মদিন পালন করতে হবে? কেক পেস্ট্রি, নেটিভেটি এবং ক্রিসমাস ট্রি-র আলোকমালায় হিন্দুরা খানিক দিশেহারা। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য-কীর্তনীয়া। শিকাগোতে তিনি হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্যেই গিয়েছিলেন। তিনি খ্রিস্টান মিশনারীদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়েও দেন, ভারতবর্ষ কখনই অধ্যাত্মসম্পদে দরিদ্র নয়, দরিদ্র অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানে। তাই ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সালের শিকাগোতে এক ভাষণে বলেন, "তোমরা খ্রিস্টানরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করবার জন্য তাদের কাছে ধর্মপ্রচারক পাঠাতে খুবই উৎসাহী, কিন্তু বলো দেখি অনাহার ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে দেহগুলো বাঁচানোর জন্য কোনো চেষ্টা কর না কেন? ভারতবর্ষে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার মানুষ খিদেয় মৃত্যুমুখে পড়ে, কিন্তু তোমরা খ্রিস্টানরা কিছুই করনি। তারা ভাত চাইছে আর আমরা তাদের পাথরের টুকরো তুলে দিচ্ছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র পড়ানো হলো তাকে অপমান করা।"

মনে রাখতে হবে স্বামীজী অন্য ধর্ম থেকে ভাব নেবার ব্যাপারে খুবই selective ছিলেন। যীশুর সামাজিক সাম্যনীতি তাঁর প্রাণ স্পর্শ করে থাকবে, জগতের কল্যাণের জন্য যে ত্যাগ দরকার হয়, তার রসদও যীশুখ্রিস্টের মধ্যে তিনি পেয়ে থাকবেন। ঔপনিবেশিক শাসনে থাকলে মানুষ স্বভাবতই শাসকের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, নতুবা নানান মত ও পথে তা অতিক্রম করতে মনস্থ হয়, কখনও ঔপনিবেশিক শক্তির মান্যধর্মকে তীব্রভাবে অস্বীকার করার মানসিকতা জন্মায়। ব্রিটিশ শাসনে থেকে স্বামীজীও হয়তো সেই ধর্মীয় পরিমণ্ডল অতিক্রম করার জন্য তাদের ধর্মীয় সেরা দিনটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই দিনটির মধ্যে হিন্দুধর্মের

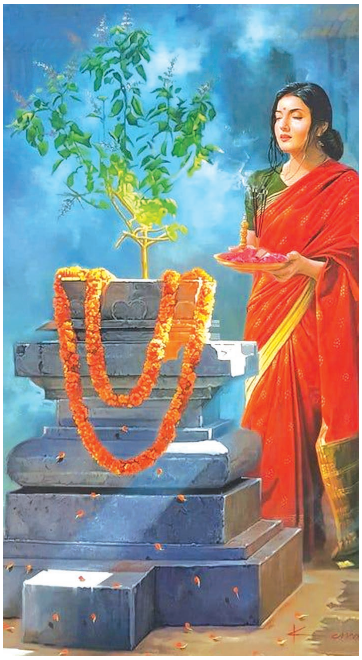

নবযুগের ইতিহাস রচনা করতে চাইলেন। তার এক দুটি উদাহরণ দেওয়া যায়।

প্রথম, ১৮৮৬ সালের বড়দিনের পূর্বসন্ধ্যায় (১৩ পৌষ, ১২৯৩) নয়জন গুরুভাই হুগলীর আঁটপুর গ্রামে বাবুরাম ঘোষের (শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ, পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ) বাড়িতে উপস্থিত হয়ে ভারতের অধ্যাত্মিক ও সামাজিক কল্যাণে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করলেন। অন্যদিনও তো করতে পারতেন, কারণ আঁটপুরে তার বেশ কয়েকদিন আগেই পৌঁছেছিলেন। মনে রাখতে হবে ১৮৮৬ সালেই আগস্ট মাসে ঠাকুরের শরীর যায়। সেদিন অশ্বত্থ তলায় ধুনি জ্বেলে তাঁরা বসলেন গভীর ধ্যানে, তারপর ঈশ্বর আলোচনা। জানা যায় স্বামী বিবেকানন্দ যীশুখ্রিস্টের কথা সেদিন বলেছিলেন। এখন প্রশ্ন এইভাবে দিনটি পালনের পরও পরবর্তীকালে পুরীতে গিয়ে সেই বাবুরাম মহারাজই কেন খ্রিস্টান পাদ্রীদের ধর্মপ্রচারের জনসমাগমকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং স্বধর্ম চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য ‘হরিবোল হরিবোল হরিবোল’ ধ্বনি দিয়ে উত্তাল করেছিলেন এবং উপস্থিত মানুষকে তাতে শামিল করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন? তাতে সফলও হয়েছিলেন। তার মানে স্বামী বিবেকানন্দ এমন কোনো দাগ তার মধ্যে রেখে যাননি, যাতে এটাকে সধর্ম প্রীতির বাইরে কিছু ভাবতে পারেন। যদিও এরপর তাঁর স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে তার ভুল ভাঙালেন এরকম ব্যাখ্যা আছে।

দ্বিতীয় ঘটনা ১৮৯২ সালের ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বরের, স্থান কন্যাকুমারী। আবারও ২৫ ডিসেম্বরকে ব্যবহার করলেন স্বামীজী। স্বামীজী অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ডাইনে-বামে-পশ্চাতে ঢেউ আর ঢেউ, অগণিত অনন্য, মহাসাগরের বুকে মিশে যেতে চায় সাগর ও উপসাগর— অনাদিকাল থেকে তাদের অভিসার যাত্রা। ১৮৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর, আকাশের এক তারা এসেছেন মত্যসাগরের ত্রিকোণ প্রেমের জলধারায় নীলকর দিয়ে। সুনীল জলধি থেকে সন্তানসম ভারতবর্ষের আবির্ভাব, মহাকালের সেই মহান অধ্যায় দেখতে এসেছেন সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক আশ্চর্য নক্ষত্র, তার অতীত ও ভবিষ্যৎ মেলাবেন সমাধিতে বসে। পাশেই সমুদ্র-তনয়া কন্যাকুমারী। বড়দিনই বটে, তার প্রাক্কালে পায়ে হেঁটে কন্যাকুমারী পৌঁছেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, তারপর মূল ভূখণ্ড থেকে সাগরসঙ্গমে ৫০০ মিটার সাঁতরে ভারতীয় পাহাড়ের শেষ বিন্দুতে পৌঁছলেন তিনি, দেখলেন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন, তারপর অতুল্য কিন্তু অভুক্ত ভারতের জন্য গ্রহণ করলেন এক অধ্যাত্মিক সংকল্প। ধ্যানের শঙ্খনাদে একাদিক্রমে তিনদিন কাটলো—২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বর।

যে খ্রিস্টান ধর্ম মানুষকে ‘পাপী’ বলে, সেই ধর্মের প্রতিবাদ কেবল স্বামীজীই করেননি, করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণও। মানুষ দেবতা, মানুষ ব্রহ্ম, সে পাপী হবে কীভাবে? সে অমৃতের সন্তান, সে পবিত্র, সে পূর্ণ, পূর্ণতা প্রাপ্তির সব যোগই তার মধ্যে আছে। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মসমাজের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু বিধবা আশ্রমের জন্য তিনি বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে টাকা তুলে পাঠিয়েছেন কেবল খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত ভারতীয় বিদূষী মহিলা রামাবাইয়ের তৈরি বিধবা আশ্রমকে ওচিত্য দেখানোর জন্য। কারণ এই মহিলা-সহ অন্যান্য খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বী ও মিশনারীরা গলা মিলিয়ে ভারতীয় বিধবাদের দুঃখের অতিরঞ্জন করতেন, স্বামীজীর তা না-পসন্দ ছিল। হিন্দু ধর্মের প্রচারে আনুকূল্য পাবার জন্য যতটুকু যীশু-ভজনা দরকার স্বামীজী তাই করেছেন, তিনি জানতেন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার ধারায় ভারত-সহ প্লাবিত হবে বিশ্বের নানান অংশ, তাই বড়দিনের মতো দিনটির মধ্যে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনের বীজ বপন করে দিলেন তিনি। এটা কলোনিয়াল প্রভাবমুক্তিরই সাধনা, সাধনা ২৫ ডিসেম্বরকে অতিক্রমের।

এই দিনে বরং বেশি করে শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ-মনন ও পূজন জরুরি। জরুরি শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজী যুগলবন্দীর আরাধনা। খ্রিস্টারে মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে না দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই যীশুখ্রীস্টকে আবিষ্কার করার সাধনা হিন্দুদের শুরু করা উচিত। সম্প্রীতির বার্তা দিতে বরং খ্রিস্টানরা প্রভু যীশুর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজে নিক।

ভারতবাসীর অন্তরে প্রশ্ন জেগেছিল, সজ্জিত নির্জীব ‘ক্রিসমাস ট্রি’-র চাইতে জীবন্ত বীরুৎ-প্রাণ তুলসী কেন আমাদের আরাধ্য হবে না! তার সুবাস, তার নির্যাস, তার বাতাস কেবল অতি পবিত্র নয়, অতীব ভেষজগুণ-সম্পন্ন। করোনা পরিস্থিতিতে তুলসীর গুণ আমাদের বুঝিয়ে দিতে হয়নি, সারা দেশে এক ধাক্কায় তুলসীর ব্যবহার বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল, তা থেকে প্রস্তুত ক্বাথ, বটিকার বেচাকেনা হয়েছে বিস্তর। আজ তাই তুলসীর ভেষজ মূল্যকে ভারতবাসীর ধন্যবাদ জানানোর দিন। ভারতবাসী অন্যান্য বছরের তুলনায় আরও অধিক ঐশী সমারোহে তুলসী-পূজন দিবস পালন করবেন ২৫ ডিসেম্বর। কারণ ভারতবাসীর বৃক্ষপূজার ধারণা নতুন নয়, উদ্ভিদের মধ্যেকার চৈতন্যও নতুন নয়। শীতের ঝকমকে রোদে যখন তুলসীমঞ্চ আলো করে পুষ্পমঞ্জুরী পেকে ওঠে, বীজ পুষ্ট হয়, তখন তার বীজ সংগ্রহ করে রাখতেন গৃহস্থ পরিবার। ক’দিন সুপ্তির পর বসন্ত এলেই তা থেকে বেরিয়ে আসতো নতুন চারা। মন্দিরের এক চিলতে জমিতে ‘তুলসীতে তুলসীতে বৃন্দাবন’ হয়ে যেতো। তারই শুভসূচনা ২৫ ডিসেম্বর। ভারতবাসীর কাছে তুলসী, মাহাত্ম্যে ‘বড়দিন’-ই বটে। শরতের দিনে যে চারা বড়ো হয়ে উঠতো, মাটির মণ্ডে শিকড় সমেত তা এদিন স্বজন-বান্ধব, প্রতিবেশীকে বিতরণ করা ছিল পবিত্র কর্তব্য। পরিবেশিত হতো নলেন গুড়ে শালিধান্যে রাঁধা পরমান্ন। কোনো কেক-পেস্ট্রি স্বাদে গন্ধে তা অতিক্রম করতে পারেনি। অনতিক্রম্য এক দিবস— তুলসী-পূজন।□

মূল্যবোধের সংকটে বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথই আদর্শ

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ

সেন্সাস রিপোর্ট নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে। অনেক তথ্যের সঙ্গে এ কথাও বেরিয়ে এসেছে যে বাঙ্গালি সমাজে নিরীশ্বরবাদী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৮১ সালে যাদের সংখ্যা ছিল ৩১৩২ মাত্র, ২০০১ সালে তা প্রায় ৫৪,৮৯৫ জন। সারা দেশে ৭,২৭,০০০ নিরীশ্বরবাদী মানুষের মধ্যে এ সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এঁদের এক প্রভাবশালী অংশ সমাজ জীবনের সর্বত্র বিরাজমান, যাঁরা বিবেকানন্দের আদর্শ সম্পর্কে উদাসীন। একদিকে নিরীশ্বরবাদ অপরদিকে সংকীর্ণ ধর্মীয় মৌলবাদ এই দুয়ের মাঝখানে উদারনৈতিক মানবতাবাদের জায়গা শুধু বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যেই নয় সমগ্র বিশ্বেই সংকুচিত হয়ে আসছে, যা সভ্যতার পক্ষে অশনি সংকেত। বিবেকানন্দের মতাদর্শ বাঙ্গালিকে মূল্যবোধের সংকট সম্পর্কে সচেতন করবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নবজাগরণের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের আলোকিত করবে যেখানে বেদ-উপনিষদের ধর্মের উপযুক্ত স্থান থাকবে। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি না থাকার ফলে ধর্মের ভিতকেই আলগা করে দিতে চাইছেন। তাতে হিতে বিপরীত হচ্ছে। বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন, 'আধুনিক সংস্কারকরা প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না করে সংস্কারের আর কোনো উপায় দেখতে পান না। তাঁরা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিফল হয়েছেন। এর কারণ কী? কারণ, তাঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই তাঁদের নিজেদের ধর্ম ভালোভাবে পড়েছেন বা আলোচনা করেছেন। আর তাঁদের একজনও সকল ধর্মের প্রসূতিকে (বৈদিক ধর্মকে) বুঝবার জন্য ধর্ম সাধনার প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়ে যাননি।' তার জন্য আবার সমাজে উন্নত মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করতে গেলে যে ধর্মকেও তার উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে তা আমাদের সমাজের এক শক্তিশালী অংশ স্বীকার করতে চান না। ফলে যে চেতনাগুলি রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ তথা বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালি মহাপুরুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল তাকে পুনরায় সমাজের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজপতিদের যে নিষ্ঠার প্রয়োজন বর্তমানে তার অভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। তাই মূল্যবোধ রক্ষার কাজও ব্যাহত হচ্ছে।

প্রায় ১০২ বছর পূর্বে স্বামীজী রামকৃষ্ণলোকে গমন করেছেন। বিবেকানন্দের ভক্তবৃন্দের মধ্যে তাঁর ভাবাদর্শের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সন্দেহ না থাকলেও বর্তমান বাঙ্গালি সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশ অধ্যাত্মবাদকে অবহেলা করার জন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মতাদর্শকেও পরোক্ষভাবে সমালোচনা করতে শুরু করেছে। তাঁরা ধর্মতন্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের পার্থক্য অনুধাবন করতে চাইছেন না বা নিজে জানলেও ধর্মের প্রতি ব্যক্তিগত অনীহার জন্য তাকে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনবোধ করছেন না। বিজ্ঞানের সূত্রগুলো কাজে লাগিয়ে কেউ অনিষ্ট সাধন করলে দোষ সে ব্যক্তির, বিজ্ঞানের নয়। তেমনি ধর্মের নামে কেউ দুরাচার সংগঠিত করলে বা সমাজে বিরোধ সৃষ্টি করতে চাইলে দোষ উক্ত ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর, ধর্মের নয়। তাই ধর্মকে অনর্থের মূল হিসেবে যাঁরা ভাবছেন তাঁরা বাঙ্গালির তথা ভারতীয়দের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে প্রায় অস্বীকার করছেন। ধর্মতত্ত্বের অসাম্প্রদায়িক যে রূপ তাকে লঘু করা অনুচিত। বিবেকানন্দ তাই জোর দিয়েছিলেন আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে। ধর্ম কী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমাদের সমস্ত সংকীর্ণ ধারণাকে পরিত্যাগ করে প্রত্যেকের মধ্যে সেই ঈশ্বরকেই দেখা উচিত। কারণ প্রত্যেক জীবের মধ্যে তিনি বাস করেন। সমস্ত মন দিয়ে তিনি মনন করেন। তিনি স্বতঃপ্রমাণ। আমাদের নিকট থেকেও নিকটতর। আর এঁকে জানাই হলো ধর্ম।'

পৃথিবীর কোনো জাতিকে উন্নত মূল্যবোধের অধিকারী হতে গেলে তার গৌরব সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি। বর্তমান বাঙ্গালি সমাজের অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে আমাদের

নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে উদাসীনতা। সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁর ঐতিহ্য সম্পর্কিত প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বেদ উপনিষদের ঐতিহ্য না থাকলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বকবি হওয়া সম্ভবপর হতো না। যোগচর্চার ঐতিহ্য না থাকলে শ্রীঅরবিন্দ সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধ্যানৈশ্বর্য না পেলে বিবেকানন্দ বিশ্বজনকে মোহিত করতে পারতেন না। বৈষ্ণবধর্মের বিশ্বপ্রেম এ দেশে না থাকলে মহাত্মা গান্ধী যুযুৎসু ইংরেজকে অহিংস পদ্ধতিতে পরাজিত করতে পারতেন না।' স্বাধীনতার পর সাহেবদের পাঠশালায় যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তাতে বাঙ্গালির গৌরবগাঁথার স্থান নেই। আমাদের মধ্যেও একশ্রেণীর মানুষের ইউরোপীয় দর্শনের প্রতি মোহাচ্ছন্ন মনোভাব ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সন্দেহ বাতিকের জন্য তাঁরা নিজেদের ঐতিহ্যকে সাহেবদের চোখ দিয়েই দেখেছেন। ফলে আমাদের যুবসমাজ আপন ঐতিহ্যকে চিনতে শেখার আগেই পশ্চিমের ভোগবাদের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূল্যবোধের স্থান কোথায় তা তো আমরা দীর্ঘ দুশো বছর ধরে প্রত্যক্ষ করেছি। সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার মধ্যে মূল্যবোধ শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। স্বামীজী সে কথা জানতেন ও নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন, 'ভাবগতিক দেখে মনে হয় সে সোশ্যালিজম (সমাজতন্ত্র) বা অন্য কোন ধরনের গণ-শাসন ব্যবস্থা, তার নাম যাই হোক না কেন, শিগ্‌গিরই চালু হবে।' ভারতবর্ষের মাটিতে স্বামীজীর স্বপ্নের সমাজতন্ত্রের সার্থক প্রয়োগ করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন বিবেকানন্দ-শিষ্য সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর প্রদর্শিত পথেই বাঙ্গালি তার সনাতন অধ্যাত্মবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে মেল বন্ধন ঘটাতে পারবে।

বিবেকানন্দের মতবাদে আমরা প্রথম পশ্চিমের ও পূর্বের শুভ প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে সার্থক সমন্বয়ের প্রয়াস পাই। পশ্চিমের বিজ্ঞান ও প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে পূর্বের সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে সফলভাবে মেলানো যায় বিবেকানন্দ সে চেষ্টা করেছিলেন। অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের গুরুত্বকেও তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, 'আমাদের কাজের মূল কথাটা সব সময় মনে রেখো— ধর্মে একটুও আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি। মনে রাখবে দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন। জাতির ভাগ্য নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাদের তুলতে পার? তাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি নষ্ট না করে কি তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাসে ও সাধনে ঘোর হিন্দু হতে পার? এইটিই করতে হবে, এবং আমরাই তা করব।' এভাবেই স্বামীজী আমাদের জাগ্রত করলেন তাঁর অমৃতমন্ত্রে। চিকাগো ধর্মসভায় তাঁর গর্বিত উপস্থিতি, ধর্ম সম্পর্কে আমাদের চৈতন্যোদয় ঘটাল। বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি আমাদের সজাগ করলেন যে বিদেশি আক্রমণকারীরা আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জগৎ নিয়ন্ত্রণ করলেও আমাদের ধর্মসংস্কৃতি বিলুপ্ত করতে পারেনি। আমরা আক্রমণকারীর ধর্ম গ্রহণ করে নিজ ধর্ম বিসর্জন দিইনি। পৃথিবীর বিস্তীর্ণ এলাকায় এ ঘটনাই ঘটেছে, তাই অধিকাংশ দেশের মানুষ তাঁদের ধর্মান্তরিত হবার ইতিহাসকে হয় গৌণ, নয় গৌরান্বিত করে দেখাবার চেষ্টা করেছে এবং আমাদের পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যকে রক্ষা করে ধরে রাখার কষ্টকর সংগ্রামকে খাটো করে উপস্থাপনার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। আমাদের নিজেদের মধ্যে ঘরশত্রুর মতো কিছু পরপদে আত্মবোধ বিসর্জন দেওয়া মানুষ বিদেশি আক্রমণকারীদের এ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করেছে। স্বামীজী এ সমস্যা অনুধাবন করে বলেছিলেন, 'আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে অনেক ঘুরেছি জগতের সম্বন্ধে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। দেখলাম সব জাতিরই এক একটা আদর্শ আছে, সেটাই জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। রাজনীতিই কোনো কোনো জাতির জীবনের মূলভিত্তি, কারও বা সামাজিক উন্নতি, কারও বা মানসিক উন্নতি বিধান, কারও অন্য কিছু। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির ক্ষেত্রে ধর্ম, একমাত্র ধর্মই হলো তার জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি। ধর্ম আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, আমাদের জীবন-প্রাসাদের মূলভিত্তি এই ধর্মের উপরেই স্থাপিত।' বাঙ্গালি যত তার মূল ভিত্তি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সমাজে মূল্যবোধের সংকট ততই প্রকট হচ্ছে। আমাদের বুঝতে হবে নবজাগরণের সময়কালে উচ্চ মূল্যবোধের বিকাশের পিছনে বেদান্তধর্ম কীভাবে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বর্তমান বাঙ্গালি সমাজে এঁদের তুল্যমূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অভাব বুঝিয়ে দিচ্ছে আমরা তাঁদের ঠিক ঠিক অনুসরণ করতে পারিনি।

স্বামীজী ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলেছিলেন কিন্তু ধর্মকে ভালোবেসে। সমাজ তাই তাঁকে ও তাঁর মতকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এখন যাঁরা ধর্ম সম্বন্ধে কটূক্তি করছেন তাঁরা নিজেরা ধার্মিক নন। তাই ধার্মিক মানুষ অবলীলাক্রমে তাঁদের মতামতকে পাশে সরিয়ে রাখতে পারেন। আমাদের সমাজে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের ন্যায় গ্রহণযোগ্যতা তাঁরা আশাও করতে পারেন না। বাঙ্গালি সমাজে তাই বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের গুরুত্ব চিরকালীন, কারণ তিনি আমাদের অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করতে সাহায্য করেছেন। সীমার মাঝে অসীমকে অনুভব করে নির্লোভ ভাবে নিষ্কাম কর্মের শিক্ষা দিয়েছেন যা দুর্নীতির মূলে আঘাত করবে। আমাদের অনুন্নতির মূলে রয়েছে সমাজ জীবনে প্রচলিত মূল্যবোধহীনতা। বিবেকানন্দের উপদেশামৃত এই রোগের মহৌষধি, কারণ আমাদের বৈদিক ধর্ম যেভাবে ত্যাগ, বৈরাগ্য, দয়া ও প্রেমভাবের মধ্যে দিয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল অর্থ উপলব্ধির মাধ্যমে মহাজীবনে উত্তরণের শিক্ষা দেয় তা সর্বজীবের মধ্যে শিবদর্শনের সাহায্যকারী। ফলে বহুজনের পক্ষে কল্যাণকর ও সুখদায়ী।

(লেখক নির্দেশক—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইনস্টিইটউট অব স্টাডিজ কলকাতা)

খেলার মাঠে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ

আমরা দেখতে পাই বিবেকানন্দের খেলা শুরু হয়েছিল শৈশবে। তাঁর দুরন্তপনায় সবাই অস্থির। তিনি দুষ্টের শিরোমণি। ক্লাসে কোনওদিন নাকি সম্পূর্ণ বসেননি। আধা বসা আধা দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁর সময় কাটত। মার্বেল, লাটিম, ঘুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, লুকোচুরি, চোর- পুলিশ, কবাডি শুধু খেলেছেন নয়— খেলায় তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। শিশুমণি বিলের চোখে তখন বাড়ির কোচোয়ান হবার স্বপ্ন, তাই আমরা দেখি পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছোটো টাট্টু ঘোড়া কিনে দিয়েছিলেন। প্রতি সান্ধ্য ভ্রমণ করেছেন, পরবর্তীকালে তাই আমরা দেখি আলমোড়ায় কুড়ি তিরিশ মাইল এক নাগাড়ে ঘোড়দৌড়েও কিছুমাত্র তিনি ক্লান্ত হতেন না।

একবার অশ্বিনী কুমার দত্ত দেখলেন দূরে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে উড্ডীন গৈরিকধারী বাড়ির গেটে ঘোড়া থামালো। এক ইউরোপীয় ঘোড়ার মুখ ধরে বাড়ির সামনে নিয়ে গেলেন। অনেকগুলি চিঠিতে স্বামীজী পরিণত বয়সে তাঁর ঘোড়া চড়া উল্লেখ করেছেন, 'তুমি যদি আমাকে পার্বত্য হরিণের মতো পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখতে অথবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের রাস্তায় চড়াই উৎরাই করতে দেখতে তবে খুব আশ্চর্য হয়ে যেতে।' (দার্জিলিং, ২৪ এপ্রিল, ১৮৯৭)। অসীম শক্তি ছিল তাঁর দেহে, চলায় ফেরায় বাঁচার আনন্দ, সে আনন্দ শুষে নিয়েছিল দীর্ঘ পাঁচ বছর পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারের পরিশ্রম। হিমালয় পেরিয়ে গিয়ে স্বামীজী তার হৃতশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন, জেগে উঠেছিল তাঁর নিত্য মূর্তি, ঘোড়ায় চড়ার যে আনন্দ তাঁকে পরম তৃপ্তি দিত, পরবর্তী চিঠিতে আমরা দেখি, ১৮ এপ্রিল, ১৮৯৮, 'আমার শরীর এই ঘোড়ার পিঠে রৌদ্রোচ্ছ্বাসে দৌড়ের দরুন একটু খারাপ আছে, (১৩ জুলাই) একটু খারাপ, রীতিমতো খারাপই হলো।

অনাবিল আনন্দের সন্ধানে তিনি এক সময়ে একটি সখের থিয়েটার দল গড়ে তোলেন ও স্বগৃহের 'পুজো দালানে' কয়েকবার অভিনয় করেন। কিন্তু একজন কাকা এ বিষয়ে আপত্তি তোলায় থিয়েটারের স্টেজের পরিবর্তে বাড়ির প্রাঙ্গণে এক ব্যায়ামের আখড়া প্রস্তুত হয় এবং বন্ধুরা সেখানে নিয়মিত ব্যায়াম আরম্ভ করেন। সেখানে আবার এক খুড়তুতো ভাই ব্যায়াম করতে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলেন; তাই ওই কাকা ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দিলেন। ফলে ব্যায়ামক্ষেত্রটি বন্ধ হয়ে গেল এবং নরেন্দ্রনাথ অতঃপর প্রতিবেশী নবগোপালবাবুর জিমন্যাস্টিকের আখড়ায় নাম লেখালেন। মল্লযোদ্ধার মতো শরীর, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, বিশাল গঠন, কর্মনিষ্ঠ পেশল বাহু, শ্যামল চিক্কন ত্বক, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল। স্বয়ং গর্ব করে বলতেন, 'আমার তাতাবী চোয়াল, তাঁর দেহে সিংহের সৌন্দর্য ও মৃগের চাঞ্চল্য।' সেই কারণে যদি একটি খেলার সূচি তৈরি করা যায় তা থেকে আমরা দেখতে পারি কত প্রকার খেলার মধ্যে তিনি (৩৯ বছর প্রায় ৬ মাস) কাটিয়েছেন। (১) মার্বেল, (২) লাটিম, (৩) চোর পুলিশ, (৪) কাবাডি, (৫) দাবা, (৬) ট্রাপিজ, (৭) অশ্বচালনা, (৮) লাঠিখেলা, (৯) অসি খেলা, (১০) নৌকা চালানো, (১১) সন্তরণ বিদ্যা, (১২) কুস্তি, (১৩) ব্যায়াম, (১৪) গলফ, (১৫) ফুটবল, (১৬) ব্যাট বল (ক্রিকেট), (১৭) ডাম্বেল, (১৮) বন্দুক চালনা, (১৯) বাইক চালানো (সাইকেল), (২০) বেলুন চড়া এবং (২১) ঘুড়ি ওড়ানো।

জেনেভার শিল্প প্রদর্শনীতে একটি বেলুন দেখে তাতে চড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, স্বামীজীর ভক্ত মিসেস সেভিয়ার আকাশে ভ্রমণ নিরাপদ নয় মনে করে, আপত্তি তোলেন। স্বামীজী তাঁর কোনও প্রকার আপত্তি মানলেন না বরং তিনি মিসেস সেভিয়ারকে বেলুনে চড়তে বাধ্য করলেন। সেদিন ছিল আকাশ পরিষ্কার, বেলুন চড়া সমাপ্ত করে তাঁরা ফটো তুলে প্রফুল্ল চিত্তে হোটেলে প্রত্যাগমন করেছিলেন।

জলক্রীড়ায় স্বামীজী ছিলেন একজন ভালো সাঁতারু। তিনি শুধু পুকুর-নদীতে সাঁতার কাটেননি, সমুদ্রেও কেটেছিলেন। ঝড়ের খেয়ায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাবার কথা সর্বজনবিদিত। ১৮৯৪ সালের পত্রে পাই কোরা স্টকহ্যাম তাঁর জন্য স্নানের পোশাক তৈরি করে দিয়েছেন এবং তিনি ঠিক হাঁসের মতো জলে নেমে মজা করেছেন। যে ব্যাপারটা 'জলকাদার জীবদের পক্ষেও পরম উপাদেয় ঠেকবে।'

১৮৯৯ সাল ভক্ত নাগমশাই স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। স্বামীজী বলছেন, 'কাজ করতে মজবুত শরীর চাই, তোমার শরীর

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে কলকাতার সংবর্ধনা সভায় আমাদের স্বামীজী বলতে পেরেছিলেন— 'আমি কলকাতারই ছেলে, এখানকার যে ধুলোয় বসে খেলেছি আমি তার উপর বসেই তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই'।

খারাপ'। কিন্তু শরীরচর্চায় এ সময় বিশ্বাস হারাননি বিবেকানন্দ। জানুয়ারি মাসে প্রিয় শিষ্যকে বলছেন, 'এখনও আমি রোজ ডাম্বেল কষি'। শরীর ও মন সমানভাবে চলা যে বিশেষ প্রয়োজন তা বিবেকানন্দ তাঁর প্রিয়জনদের বারবার বলেছেন। ১৯০১ সাল শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী বলেছেন, 'ঢাকায় নাগ মশাইয়ের বাড়িখানা কী মনোরম যেন শান্তির আশ্রয়, ওখানে গিয়ে পুকুরে সাঁতার কেটে নিলুম। তারপর এসে নিদ্রা দিলুম, বেলা আড়াইটা।' (অচেনা বিবেকানন্দ, পৃ. ২১৬-১৭)। স্বামীজী অনেক খেলাই খেলেছেন। ১৮৯৯-এর নভেম্বর মাসে স্বামীজী তাঁর শেষ আমেরিকা ভ্রমণের সময় লেখাপত্রে দেখতে পাওয়া যায় মিস্টার লেগেড-এর বাড়িতে আছেন। তাঁর নিজস্ব একটি গলফকোর্ট আছে। লেগেডের আমন্ত্রণে অনেক বড়ো বড়ো খেলোয়াড় সেখানে খেলতে যান। স্বামীজী একদিন গলফ কোর্টে বেড়াচ্ছেন। বেড়াতে বেড়াতে সঙ্গী বালক হলিস্টার মিসেস লেগেডের পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কত মারে গর্তে বলটি পড়তে পারে'। হলিস্টার বলেন, সাত আটবার লাগে, স্বামীজী চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন, 'আমি একবারেই ফেলে দিতে পারি'। স্বামীজী পকেট থেকে এক ডলার বের করে বললেন, 'এই আমার বাজি'। ইতিমধ্যে মিস্টার লেগেড বাজির কারণ জেনে বললেন, 'অসম্ভব, কমপক্ষে চার মারের কমে ওই গর্তে ফেলা যায় না। আপনি চাইছেন এক মারে ফেলতে। এটি হিপ্নোটিজিম বা মেসমেরিজমের খেলা নাকি'। তখন স্বামীজী হেসে বললেন, 'অত কথা বলে লাভ কী। আপনার বাজি কত বলুন।' মিস্টার লেগেড মানি ব্যাগ থেকে দশ ডলার বের করে বললেন, 'এই আমার বাজি'। স্বামীজী এবার ক্লাবটি হাতে নিয়ে (গলফ খেলার লাঠি) কিছুক্ষণ গর্তের কাছে পতাকাটির দিকে তাকালেন এবং মনসংযোগ করলেন। স্বামীজী ক্লাবটি কয়েকবার দুলিয়ে বলে আঘাত করলেন। বলটি তীব্র বেগে অর্ধচন্দ্রাকারে শূন্য দিয়ে ছুটে চলল এবং ঠিক গর্তে গিয়ে পড়ল। হলিস্টার হায়! হায়' করে উঠল। হতভম্ব মিস্টার লেগেড বিড়বিড় করে বললেন— ভারতীয় যোগীর অলৌকিক খেলা।

অপূর্ব মানুষ এই বিবেকানন্দ। গুরুভাইদের সঙ্গে কম্বলের চার খুঁট ধরে গঙ্গাধর মহারাজকে লোফালোফি করছেন। পরিব্রাজককালে দুহাতের মধ্য দিয়ে শরীর গলানোর খেলা দেখিয়ে খুশি করছেন এক বালককে।

সেই কারণেই হয়তো আমেরিকা থেকে ফিরে এসে কলকাতার সংবর্ধনা সভায় আমাদের স্বামীজী বলতে পেরেছিলেন--- 'আমি কলকাতারই ছেলে, এখানকার যে ধুলোয় বসে খেলেছি আমি তার উপর বসেই তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই'— স্বামীজীর সেই কথাগুলোই আমরা মনে করেছি সুন্দর ভাষণ কিন্তু গভীরভাবে বিশ্বাস করেনি যার দিকে তাকালে অপার বিশ্বাস আসে, তিনিও আমাদের মতো খেলেছিলেন, তিনিই সপ্তঋষির এক ঋষি। তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। যাঁর আকর্ষণে সেই স্বামীজীর বক্তৃতা যখন আমরা স্মরণ করি বিবেকানন্দের জীবনীকার শ্রীমতী লুইবার্ক (গায়ত্রী) এর লেখায়। স্বামীজীর সবই অদ্ভুত। কখন যে কী মনে উদায় হয় সে বড়ো রহস্যভরা উন্মাদনাপূর্ণ ব্যাপার। একবার হলো কী! তখন তিনি ইংল্যান্ডে, লাইকেল অ্যাডভেঞ্চারের বিবরণ তাঁর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণে জানা যেতে পারে। একদিন স্বামীজী খুব প্রফুল্ল। বেলা বারোটার সময় বললেন, 'চ, সকলে মিলে সম্মুখের মাঠে গিয়ে বাইক চড়ি'। অর্থাৎ সাইকেল চড়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মিস মুলারের আর্থার নামে একটা মালি ছিল। সে মিস মুলারের গ্রিন হাউস থেকে একটা বাইক মাঠে পৌঁছে দিয়ে এল। সারদানন্দ স্বামী বাইকটি ধরলেন, আর স্বামীজী মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাঁধে হাত দিয়ে বাইকে উঠে বসলেন। অনভ্যস্ত, সেইজন্য দুজনে দুইদিক থেকে বাইকটি সামলাতে লাগলেন। তারপর স্বামজী সারদানন্দ স্বামীকে বললেন, 'তুই চড়, শেখ-না, দিনকতক চেষ্টা করলে অভ্যাস হয়ে যাবে।' সারদানন্দ স্বামী অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীজীর খাতিরে বাইকের উপর চড়ে বসলেন। মোটা মানুষ বড়ো ভয় করতে লাগল। সেজন্য দুজন দুপাশ থেকে তাকে আটকাতে লাগল। ...সারদানন্দ স্বামী একটু পরে নেমে পড়লেন। স্বামীজী আবার বাইকে উঠলেন। সেদিন মনটা খুব প্রফুল্ল ছিল, মৃদু স্বরে বাংলায় গান গাইতে লাগলেন, 'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে, ভাসল তরী সকালবেলা, ভাবিলাম জলখেলা, মধুর বহিবে সমীর, ভেসে যাবে বঙ্গে'।

ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথায় ফুটে উঠেছে ১৮৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে পড়ার ঘরে নরেন্দ্রনাথ ও রাখালের একটি মনোজ্ঞ চিত্র। তখন রাত, পাশাপাশি শুয়ে আছে। খানিক রাতে দুজনের মধ্যে তর্ক শুরু হলো। রাখাল বলল যে নরেন্দ্রনাথ অনেকদিন জিমন্যাস্টিক ছেড়ে দিয়েছে, সে এখন Peacock march বা উর্ধ্বপদ গমন করতে পারে না, এই তর্ক উঠলে এক টাকা বাজি ধরা হলো। অর্ধেক রাত্রে তখন দুজন উঠে সামনের দালানে জিমন্যাস্টিক শুরু করল। নরেন্দ্রনাথ মালকোঁচা মেরে দালানটাতে উর্ধ্বপদে ভ্রমণ করতে লাগল, আর রাখাল সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল, পাশের ঘরে যারা শুয়েছিল তাদের ঘুম ভাঙলে, বকাবকি শুরু করল, 'কী উৎপাতে ছেলে! আদ্দেক রাতে উঠে জিমন্যাস্টিক শুরু করেছে, ছোড়া দুটো মাথা পাগলা, একটু বিবেচনা নেই যে লোক ঘুমুচ্ছে।'

ক্রিকেট ইদানীং যুগের শ্রেষ্ঠ খেলা, ক্রিকেট রাজার খেলা, নরেন্দ্রনাথ দত্তও প্রথম বয়সে খুবই ব্যাটবল খেলেছেন, তার তখনকার দিনে কলকাতায় চলিত কথায় বলা হতো 'ব্যাটবল', মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্মৃতিকথায় জানা যায়, তিনি পাড়ার অনেক ছেলেকে বাইরের উঠোনে জড়ো করেন শীতের বিকালে। তখন এই খেলা খুবই প্রচলিত ছিল এবং তিনি বল মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি নাকি কলকাতার টাউনক্লাবে খেলতেন। ১৮৯৫-৯৬ সালে স্বামীজী তখন লন্ডনে। রঞ্জিত সিংজী অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইংল্যান্ডের সম্মান রক্ষা করেছিলেন। ১৫৪ রান করেও নট আউট। অসাধারণ পালোয়ানি শক্তিতেও তিনি পিছিয়ে থাকেননি। কিশোর নরেন্দ্রনাথ ঘোড়ার মুখের বলগা ধরে ঝুলে পড়ে ঘোড়া থামিয়ে আরোহিণীর যেমন প্রাণ বাঁচিয়েছেন, তেমনি আবার শক্তিধর গুরুভাই নিরঞ্জনানন্দ ও জিজিকে মুহূর্তে ভূমিসাৎ করেছেন তার পালোয়ানগিরিতে। সুন্দরম আয়ারকে বলেন, 'এসো পাঞ্জা কষি'। হেরে গিয়ে আয়ার মহাশয় নাম দিলেন 'পালোয়ান স্বামী'। শুধু কী তাই, বন্ধুত্বের বিবাদে মধ্যস্থ হবার কালে শক্তির অস্ত্ররূপে তাকে দেখা গেছে বক্সিং-এর স্টাইল প্রয়োগ করতে।

তথ্যসূত্র : (১) যুগনায়ক বিবেকানন্দ-স্বামী গম্ভীরানন্দ। (২) সহাস্য বিবেকানন্দ-শঙ্করী প্রসাদ বসু। (৩) অচেনা অজানা বিবেকানন্দ-শংকর।

(স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

লাভ জেহাদিদের পাতা ফাঁদ

জেহাদ শব্দটি বাংলা না হলেও আমাদের বাঙ্গালিদের কাছে শব্দটির অর্থ অজানা নয়। কোরানের নির্দেশ অনুসারে অমুসলমানদের মুসলমান বানানোর জন্য যে সংগ্রাম সেটাই জেহাদ। এরপর আসছে লাভ জেহাদি। এদের উদ্দেশ্য অমুসলমান কিশোরী বা তরুণীকে নিজের আত্মপরিচয় গোপন রেখে প্রেমের অভিনয় করে প্রতারিত করে মাকড়সার মতো নিজের পাতা ফাঁদে টেনে আনা যেখান থেকে সেই কিশোরী বা তরুণীটির বের হয়ে আসার আর কোনও উপায় থাকে না। তখন সে আত্মসমর্পণ করে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হয়। তারপর তাকে জেহাদি বানানো হয় নয়তো তাকে নিকাহ করে সংসারী বানিয়ে বছর বছর সন্তানোৎপাদন করিয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া হয়। অতি সম্প্রতি হুগলি জেলার ধনিয়াখালির নবম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীকে বাংলাদেশে পাচার করে জেহাদি বানানো হয়েছে। মেয়েটি নিজে বাংলাদেশ থেকে ফোন করে বাড়িতে জানিয়েছিল। এখন দেখা যাক কীভাবে লাভজেহাদিরা কাজ করে। সাধারণত সুদর্শন কোনও মুসলমান যুবককে এসব কাজে নিযুক্ত করা হয়। এরা সাধারণত একা চলাফেরা করা কোনও মেয়েকে টার্গেট করে, ছলছুতোয় সাহায্য করার নামে আলাপ করে। পরে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। পরে ঘনিষ্ঠতা বাড়লে মাঝে মাঝেই দেখা করে। মেয়েটির স্কুল ছুটির সময় স্কুলের কাছে বাইক নিয়ে অপেক্ষা করে। পরে মেয়েটিকে বাইকে চাপিয়ে দূরে কোথাও চলে যায়। রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে, গল্পগুজব করে, সিনেমা দেখে। এইভাবে ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। আর এক রকম আছে। মেয়ে স্কুলে যায় স্কুলবাসে পিঠে ব্যাগ নিয়ে। বাস থেকে নেমে স্কুলে পৌঁছে যায়, তারপর বেরিয়ে পড়ে। আগে থেকে কাছাকাছি স্থির করে রাখা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায় যেখানে সেই জেহাদি বাইক বা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর দুজনে মিলে লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়ে। আগে থেকে বুক করে রাখা কোনও হোটেলের কোনও রুমে সময় কাটায়। তারপর স্কুলছুটির সময় স্কুলে ফিরে এসে স্কুল বাসে চেপে বাড়ি ফেরে। অভিভাবকরা জানল মেয়ে স্কুল থেকে বাড়ি এল। মেয়ে যে সারাদিন কোথায় ছিল, কী করল অভিভাবকরা জানতেই পারল না। এইভাবে চলতে চলতে একদিন মেয়েটির সর্বনাশ সাধন হয়। লাভ জেহাদিটির আসল পরিচয় এবং উদ্দেশ্য মেয়েটি জানতে পারে। তখন তার ধর্মান্তরিতা হয়ে ওই লাভ জেহাদিটির প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া বা আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ

সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে পুরসভা ৭নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে পাকা শৌচাগার করে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বলে জানা গেছে। এই অভিযোগ তুলে ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের অভিযোগ ৩ বছর আগে শৌচাগারের নামে কারও কাছে ১ হাজার আবার কারোও কাছে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত শৌচাগার করে দেওয়া হয়নি আর টাকাও ফেরত দেওয়া হচ্ছে না। যদিও এলাকার মানুষের এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পুম্পা দেবী।

ওই ওয়ার্ডের মানুষের এও অভিযোগ যে, দীর্ঘদিন থেকে আজ হবে, কাল হবে বলে ঘোরাচ্ছেন ওই কাউন্সিলার। নানা কারণ দেখিয়ে এলাকার মানুষকে বছরের পর বছর সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন তিনি।

যদিও পুম্পা দেবী তাঁর বিরুদ্ধে বাসিন্দাদের তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেন যে, ঠিকাদার সংস্থাকে তিনি নিজে ২ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। কাজ না করে পালিয়ে গেছে। কিন্তু কারো কাছ থেকে কোনও টাকা নেওয়া হয়নি।

শুধু লকডাউন ও করোনার কারণেই নাকি কাজে কিছুটা দেরি হয়েছে। যাঁরা আবেদন করেছেন তাদের প্রত্যেককে শৌচাগার করে দেওয়া হবে। ঘরের জন্য যারা আবেদন করেছেন তাঁরা ঘরও পাবেন বলে তিনি আশ্বস্ত করছেন। এদিকে এলাকার মানুষের মনে এ প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে যে, আমরা আদৌ কি শৌচাগার ও ঘর পাব? এই শৌচাগার ও ঘর পাওয়ার আশাতে আর কতদিন বসে থাকতে হবে?

এলাকার বাসিন্দাদের তরফে এ অভিযোগও উঠেছে যে, কাউন্সিলার (টিএমসি) এলাকায় কোনো উন্নয়ন করেননি। কেবল লকডাউনের সময় ২ কেজি গম ছাড়া আর কোনো কিছুই পাওয়া যায়নি। অথচ দেখা যায় যে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নানা অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। এদিকে রাজ্য সরকার ঘটা করে নানা উন্নয়নের ঢাক পেটাচ্ছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য, তবে কি এটাই উন্নয়নের বহর? এসব ঘটনা তো জেলা শহরের এক সামান্য নমুনা মাত্র। খোঁজ করলে এ জেলার অনেক ব্লকের গ্রামের আনাচে-কানাচে এ ধরনের বহু ঘটনার খোঁজ পাওয়া যাবে। একদিকে যেমন রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

অন্যদিকে তেমনি, তোলাবাজি, খুন, জখম, ধর্ষণ-সহ নানা অসামাজিক কাজ দুষ্কৃতীরা প্রশাসনের সামনেই করে বেড়াচ্ছে। যা জনগণের প্রভূত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্যের জনগণ এমন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে অতিষ্ঠ হয়ে এবার হয়তো এরূপ জঙ্গলরাজের অবসান ঘটাতে পারেন।

—**মহাবীর প্রসাদ টোডি,**
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।

ফঃ ৩

সোয়েব আখতারের ভারত আক্রমণ প্রসঙ্গে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রাক্তন ফার্স্ট বোলার শোয়েব আখতারের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিয়োটিতে শোয়েব বলেছেন— একদিন কাশ্মীর দখল করবে পাকিস্তান তার পরেই গোটা ভারত জুড়ে হামলা চালানো হবে। এমনই দাবি প্রাক্তন পাক পেসার সোয়েব আখতারের। শোয়েবের একটি পুরোনো ভিডিয়ো সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে, যেখানে একটি টিভি চ্যানেলে পাক পেসারকে ইন্টারভিউ দিতে শোনা গিয়েছে। সেখানেই এই ধরনের বিতর্কিত কথা তুলে ধরেছেন শোয়েব।

এই ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্যের জেরে ইতিমধ্যেই বেশ বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সোয়েবের এই গজওয়া এ হিন্দ সম্পর্কে বক্তব্য শুনে অনেকেই বেশ ক্ষুব্ধ। একজন ক্রিকেটার হয়ে কী করে এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন তিনি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তিনি বলেছেন, ভারত দখলের কাজ মুসলমানরাই করবে। উল্লেখ্য গজওয়া এ হিন্দু শব্দের অর্থ ভারতের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ।

সেকথার উল্লেখ করে এই পাক পেসার বলেন বেশ কয়েকটি ধর্মীয় বইতে এই যুদ্ধের কথা রয়েছে। ধর্মীয় আইনও তার সমর্থন করে। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস বলেন গজওয়া-এ-হিন্দ হবে। ভারতের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে নামবেন মুসলমানরা। শোয়েব আরও বলেন, এই লড়াইয়ের রক্তবন্যা বইবে। অ্যাটকের নদী লাল রঙ ধারণ করবে। আফগানিস্তান থেকে সেনা আসবে। শুরু হবে সিরিয়া থেকে, তারপর আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান এবং পাকিস্তান থেকে মানুষ ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে ভারত দখলের জন্য। সবার আগে পাক সেনাবাহিনীর কাশ্মীর দখল করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শোয়েব আখতার পাকিস্তানি নাগরিক। তিনি পাকিস্তানের নোংরা শাসকদলের মতোই যে নোংরা কথা বলবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে ভারত ও হিন্দু বিরোধিতা করে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত পাকিস্তান টিকে আছে শুধু ভারত বিরোধিতার ওপর দাঁড়িয়ে। বর্তমানে পাকিস্তানের অর্থনীতি ধ্বংসের পথে। বিশ্বের আর্থিক সংস্থাগুলি এই মুহূর্তে পাকিস্তানকে ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করতে রাজি নয়। একমাত্র চীনের সামান্য কিছু সাহায্যে কোনোরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে দেশটি চলছে। ইমরান সরকার মুসলমান দেশগুলির দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে গেলেও সেখান থেকে ভিক্ষা পাওয়ার বদলে ঘাড়ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে। পাকিস্তানের জনগণ সরকারের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। একটি ডিমের দাম যেখানে ত্রিশ টাকা, তাতেই বোঝা যায় সেখানকার লোকের জীবনযাপনের মান কোথায় নেমেছে।

'কাশ্মীরের যে অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত তা একদিন আল্লার দোয়ায় পাকিস্তানের হাতে আসবে। শুধু তাই নয়, দিল্লিও একদিন আল্লার দোয়ায় পাকিস্তানের হস্তগত হবে।' পাকিস্তানের শাসকরা দিনের পর দিন পাকিস্তানি জনগণকে 'কাশ্মীর ও দিল্লি লাড্ডু খাইয়ে নেশাগ্রস্থ করে রেখে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে। শোয়েবও সেই দিল্লিকা লাড্ডু খেয়েছেন কিনা জানা নেই। পাকিস্তানি শাসকদের মধ্যে জিন্না (১৯৪৭ সালে)। আয়ুবখান (১৯৬৫ সালে), ইয়াইয়া খান (১৯৭১ সালে) এবং মোশারফ হোসেন (১৯৯৯ সালে) দিল্লির লাড্ডুর স্বাদ ভালোভাবেই উপভোগ করেছিলেন। সেকথা কী শোয়েবের জানা আছে?

মনে হয় পাকিস্তান সরকারের কোনোরকম লোভনীয় উপঢৌকন পাওয়ার আশায় শোয়েব এরকম একটা সন্ত্রাসী বক্তব্য রেখেছেন। কেননা বিশ্ব ক্রিকেটে সোয়েব একজন বহুল পরিচিত মুখের অধিকারী এবং তাঁর যথেষ্ট গুণমুগ্ধ ভক্ত রয়েছে বিশ্বজুড়ে। তাই তাঁর কোনো কথাকে হেলাফেলা করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই পাকিস্তানি জনগণ যদি দিল্লিকা লাড্ডু খাওয়ার আশায় ইমরান বিরোধিতা থেকে সরে আসে তাতে মন্দ কী।

শোয়েবের এই বক্তব্যের পর ভারত সরকারের উচিত যে কোনো কারণেই হোক না কেন শোয়েবের ভারতে আগমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা এবং বিশ্ব ক্রিকেটের কোনো মঞ্চেও যেন শোয়েব উপস্থিত হতে না পারেন তার পদক্ষেপ নেওয়া। কেননা শোয়েব ক্রিকেটের নায়ক হলেও তিনি যে আসলে একজন সন্ত্রাসবাদী তা তাঁর বক্তব্যেই প্রকাশ পেয়েছে। তাই কোনো সন্ত্রাসবাদীকে ভারতে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়— ১৯৪৬ সালের ২৭-২৮ জুলাই বোম্বেতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন' বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাবের কথা। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন স্থির হয় ১৬ আগস্ট।

দেশভাগের সময়কার হিন্দু বজ্জাতগুলোর উত্তরসূরীরা তাদেরই মতো এখনও উল্লেখিত সন্ত্রাসবাদীগুলোকে প্রকাশ্যে সমর্থন করে যাচ্ছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয়, প্রগতিশীল বাঙ্গলার বুদ্ধিজীবীরা সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে প্রাপ্তিযোগ বন্ধ হওয়ার ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন। সে কারণেই হয়তো শোয়েবের বক্তব্যের পরে মুখ বুজে রয়েছেন এবং পরে হয়তো এর বক্তব্যের ওপর দামি মলমের প্রলেপ কিংবা দামি সুগন্ধি ছিটিয়ে বক্তব্যকে সহামূল্যবান বাণীতে পরিণত করবেন। কাজেই শোয়েব আখতার যেহেতু পাকিস্তানি নাগরিক এবং পাকিস্তান যদি ভারত দখলের প্রস্তুতি শুরু করে তাহলে ভারতের সন্ত্রাসীদের এবং হিন্দু বুদ্ধিজীবী নামক দুষিত রক্তের অধিকারীদের পূর্ণ সমর্থন পাবে তা জলের মতো পরিষ্কার। শোয়েব তার বক্তব্যের মাধ্যমে ভারতের বুদ্ধিজীবীদের জল মেপে নিলেন। □

সুরার ভিড়ে সুরের মিড়

রূপশ্রী দত্ত

আমাদের কর্মী বোনেরা, আজকাল নানা ক্ষেত্রে নিজেদের সত্তাকে ছড়িয়ে দিতে পারছেন, এটা খুবই আশার কথা। কোনও কাজই ছোটো নয়, অসম্মানজনক নয়, যদি তার মধ্যে, প্রয়োজনীয় নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আরোপ করা যায়, এই সত্য তাঁরা নিজেদের জীবনে প্রমাণ করেছেন।

সম্প্রতি, তার একটি নিদর্শন পেয়েছিলাম। তখন শীতকাল। গঙ্গাবক্ষে স্টিমার পার্টি চলেছিল। স্টিমারে বিচিত্র লোকজন, বিচিত্রতর তাদের পোশাক-আশাক ও হাবভাব। বিস্তীর্ণ ডেকের প্রান্তে সারি সারি চেয়ার পাতা। সেখানে বসে নানান বয়সের, নানান শ্রেণীর নর-নারী গল্পগুজবে রত। রঙিন পানীয়, দ্বিপ্রাহরিক আহার ও বৈকালিক চায়ের বন্দোবস্ত সেখানেই ছিল। সুবিধার সদ্ব্যবহার করছিলেন। শীতের ছোটো দিন গড়িয়ে চলেছিল অতি সহজেই। নেমে আসছিল সান্ধ্য আবছায়া।

সামনের চেয়ারে বসা একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়ল। তার পাশে একটি ছোটো ছেলে। সম্ভবত তার ছোটো ভাই। মেয়েটি সুন্দরী নয়। কিন্তু লাবণ্যময়ী, দীর্ঘাঙ্গী ও শ্যামলী।

তার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়পর্ব সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়ালেন এক ভদ্রলোক। বললেন— 'মুনলাইট হোটেলের গায়িকা মিস চম্পা এখন আপনাদের গান শোনাবেন। আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে সেই চটুলতাবর্জিত, সহজ-সুন্দরী মেয়েটি উঠে গিয়ে দাঁড়াল মাইক্রোফোনের সামনে। তারপর সপ্রতিভ ভঙ্গিতে উঠতি হিন্দি ফিল্মের হিট গানগুলো গেয়ে গেল উপস্থিত শ্রোতাদের অনুরোধে।

জনপ্রিয়তমা অবাঙ্গালি দ্বৈত শিল্পীর অনুকরণে, গানের লঘুচপল সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ রেখে শ্রোতাদের মাতিয়ে সে আবার ফিরে এল নিজের আসনে। অজস্র হাততালি শুরু হলো। নিজেও তাতে হাত মেলালাম। তাকে জানালাম— 'গান খুব ভালো লাগল।' মেয়েটি মৃদু হাসল। জিজ্ঞেস করলাম— 'হোটেলে গান গাইতে কোনও অসুবিধে হয় না?' সে বলল— 'অসুবিধে হবে কেন? আমি তো গান গাই, বাড়ি চলে আসি।'

কথায় কথায় জেনেছিলাম, ওর বাড়িতে অসুস্থ বাবা-মা। ওরা তিনবোন ও এক ভাই। অসুস্থ শরীরে সংসার টানার ক্ষমতা বাবার যৎসামান্য ছিল। চম্পার ছিল সুকণ্ঠ। গান শুনেই আয়ত্ত করার ক্ষমতা। কিছু তালিমও পেয়েছিল। এক আত্মীয়ের সুপারিশে যখন এই চাকরিটা পাওয়ার কথা হলো, তখন প্রথমে বাবা মায়ের মনে কিছুটা কুণ্ঠা ছিল কিন্তু চম্পার কাছে গান হলো আরাধনা।

তাই সে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে না। তার নিমীলিত চোখের সামনে তাই ক্ষণিকের পান্থশালা হয়ে ওঠে দেবালয়; ভোজনালয় রূপান্তরিত হয় ভজনালয়ে আর মদিরারসিক মানুষ পরিবর্তিত হয় সংগীতপিপাসু, উৎসুক রসগ্রাহী সত্তায়। □

বাড়িতে সুগার পরীক্ষা করার সময় সচরাচর যেসব ভুল হয়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আমদের শরীরে সচরাচর যেসব ক্রনিক রোগ দেখা যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো ডায়াবেটিস। এই রোগ থাকলে ওযুধ বা ইনসুলিনের সাহায্যে সুগারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সুগারের মাত্রা যদি অতিরিক্ত বেড়ে যায় তাহলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কিডনি, চোখ ইত্যাদি নানাভাবে বিকল হতে শুরু করে।

ডায়াবেটিক রোগীর সুগার নিয়মিত পরিমাপ করা জরুরি। সুগার খুব বেড়ে গেলে তাকে বলে হাইপারগ্লাইসেমিয়া আর কমে গেলে তাকে বলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া। সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পরলে আচমকা নানা সমস্যা তৈরি হতে পারে। এখনকার দিনে বাড়িতেই সুগার পরিমাপ করা যায়। গ্লুকোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে সুগারের পরিমাপ করা হয়। কিন্তু এইভাবে বাড়িতে সুগার মাপতে গেলে অনেকেই নানাবিধ ভুল করে ফেলেন, যার ফলে সুগারের সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না। কী কী ভুল হয় এবং সেগুলো কীভাবে ঠিক করা হয়, সেটা একঝলক দেখে নেওয়া যাক—

১. পোস্টপ্রানডিয়াল (পিপি) ব্লাড সুগার :

সুগার দুভাবে মাপা যায়— ফাস্টিং বা খালিপেটে ও পিপি বা খাওয়ার পরে। সাধারণত খাওয়ার দু' ঘণ্টা পরে এই পিপি-র জন্য রক্ত নেওয়া হয়। বেশিরভাগই খাওয়া যখন শেষ হয়, তখন থেকে দু ঘণ্টা গুনতে শুরু করেন, কিন্তু প্রকৃত নিয়মটা হলো যখন খাওয়া শুরু করছেন সেই সময় থেকে ঘণ্টাদুয়েক পরে রক্ত নিলে একদম ঠিকঠাক পরিমাপ আসে।

২. প্রিকটাইমিং :

কখন রক্ত নেবেন সেটার উপরও নির্ভর করে সুগার পরীক্ষার ফলাফল হবে। ঠিকঠাক রেজাল্ট পাওয়ার জন্য দিনে কয়েকবার ব্লাড প্রিক করুন মানে রক্ত টানুন। কেননা সারাদিনে শরীরে মানসিক ও শারীরবৃত্তীয় নানারকম পরিবর্তন হয়। কাজেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুগারও ওঠানামা করে। সেজন্যই কয়েকবার দেখা উচিত। একবার দেখে রেখে দিলেই হবে না।

৩. কোন আঙুল থেকে নেবেন :

কোন আঙুল থেকে রক্ত নেবেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন একই আঙুল থেকে রক্ত নিয়ে সুগারের মাত্রা পরীক্ষা করা কিন্তু ভুল। এতে ব্যথা হতে পারে কিংবা ছোটোখাটো আঘাতও লেগে যেতে পারে। কাজেই প্রতিদিন সুগার মাপার সময়ে দুহাত অল্টারনেট করে এক্কেকদিন এক্কেকটা আঙুল থেকে রক্ত নিলে কোনও একটা আঙুলের উপরে চাপ পড়ে না।

৪. একবার ফোটানোর জন্য একটাই সূচ :

অনেকেই খরচ বাঁচানোর জন্য কিংবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক একবার একটা সূচ ব্যবহার করলে সেটা দিয়ে পাঁচ থেকে ছয়বার রক্ত টানতে থাকেন। এটি ভীষণ ভীষণই ভুল একটি পদক্ষেপ। জানেন কী, এর থেকে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে? কাজেই একবার প্রিক করার জন্য একটি সূচ ব্যবহার করে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সেটাকে ফেলে দিন। দ্বিতীয়বারে নতুন সূচ নিন।

৫. সূচের গভীরতা :

এক-একটি সূচের গভীরতা এক-একরকম হয়। কারও হাতের আঙুলের ত্বক পাতলা কারও বা মোটা, তার উপর নির্ভর করেই সূচের গভীরতা বাড়ানো বা কমানো যায়। ঠিকঠাক প্রিক করার জন্য একে ৩-৪ এর মধ্যে রাখতে হয়।

৬. স্যানিটাইজ করা :

যে আঙুল থেকে রক্ত টানবেন সেই আঙুল তো বটেই উপরন্তু দুটো হাতও ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে স্যানিটাইজ করা উচিত। তাহলে সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে। যে আঙুলটি থেকে রক্ত টানবেন শুধু সেটা একবার স্পিরিট দিয়ে ধোওয়ার পরেই তাড়াহুড়ো করে প্রিক করবেন না। হাত থেকে স্যানিটাইজারের স্পিরিট পুরো শুকিয়ে গেলে তারপরেই প্রিক করুন।

৭. সুগারের পরিমাণে পার্থক্য :

বাড়িতে গ্লুকোমিটারে যে সুগার দেখলেন ল্যাবরেটরিতে টেস্টে তার থেকে ভিন্ন রিপোর্ট আসতেই পারে। তবে এটা দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। এটা স্বাভাবিক। □

ফিরোজ মিনারে এখনও তীর্থযাত্রীরা প্রদীপ জ্বালান

তরুণ কুমার পণ্ডিত

বাঙ্গলার অতীত যুগের কথা স্মরণ করলে মালদার যে ইতিহাস- প্রসিদ্ধ স্থানের কথা সর্বাগ্রেই মনে পড়ে, তা হলো 'গৌড়'। রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী। মালদা শহর থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে গৌড়ের অবস্থান। গৌড় কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙ্গলার রাজধানী ছিল এবং সমৃদ্ধ নগর রূপে সমগ্র আর্যাবর্তে তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, বরেন্দ্র রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ ছিল মালদহ। হিন্দু গৌড়ের এই স্থানকে লক্ষ্মণাবতী বা এর উত্তর অংশে হিন্দু গৌড়ের প্রাচীন রাজধানী রামাবতীর ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। এই স্থানে আছে বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ রামকেলি, যেখানে শ্রীচৈতন্য দেবের পদধূলি স্পর্শে পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছিল। রামকেলির যে তমাল বৃক্ষমূলে তিনি বিশ্রাম করেছিলেন, সেখানে তাঁর পদচিহ্ন আজও বিদ্যমান এবং অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বহন করছে।

ঐতিহাসিকদের মতে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা শশাঙ্ক গৌড়ের রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গৌড় একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সেই সময় এই রাজ্যের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। তখন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, মালদা মুর্শিদাবাদ থেকে আরম্ভ করে উৎকল বা ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শশাঙ্ক ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার পর ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তারপর ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ একশো বছর শুধু গৌড় কেন, সমস্ত বঙ্গদেশের ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগ ছিল। এরপর যশোবর্মন ও কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য রাজত্ব করেন। ৬৫০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অরাজকতার (মাৎস্যন্যায়) পর রাষ্ট্র নায়কেরা গোপালদেবকে রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেন। তিব্বতীয় ইতিহাসে উল্লেখ আছে, গৌড়ের রাজা দেবপাল (৮১০-৮৫০ খ্রি.) মগধ ও বরেন্দ্রভূমি স্বরাজ্যভুক্ত করেছিলেন। পাল বংশের পর সেন রাজারা গৌড়ে রাজত্ব কায়েম করেন। হর্ষচরিত, রাজতরঙ্গিনী এবং বিভিন্ন প্রদেশের লিপিগুলিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। গৌড় দুর্গ নির্মাতা বল্লাস সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রি.) গৌড় রাজ্য শাসন করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে গৌড় যেমন শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল তেমন আর কোনোদিন হয়নি। ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেন গৌড়ের সিংহাসনে বসেন।

লক্ষ্মণ সেন গৌড়ের শেষ হিন্দু রাজা। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন মুসলমানদের বাধা দিতে ত্রুটি করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গৌড় রক্ষা করতে পারেননি। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে গৌড়নগর সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের হস্তগত হয়। কুতুবুদ্দিনের

> **মুসলিম শাসকরা ভারত আক্রমণ করে বহু নগর ধ্বংসের সাথে সাথে বহু মন্দির ভেঙে সেই জায়গায় মসজিদ অথবা অন্য কোথাও মন্দির ভেঙে সেই মালমশলায় এখানে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। সেই স্মৃতি আজও আমরা বহন করে চলেছি।**

আদিনা না কি আদিনাথ ?

সালটা ১৩৪৫। এই বছর সুলতান ইলিয়াস শাহ মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত আদিনাথ মন্দির ধ্বংস করেন বলে জনশ্রুতি বহুকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে। ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ পরে ওই জায়গায় আদিনা মসজিদ নির্মাণ করান। এই জনশ্রুতি কতটা সত্যি তার কিছু প্রমাণ বর্তমান আদিনা মসজিদে গেলেই পাওয়া যাবে। প্রথম প্রমাণ মসজিদের দেওয়াল। দেওয়ালের উপরিভাগ লাল ইটের তৈরি আর নীচের দিক ধূসরবর্ণের পাথর দিয়ে তৈরি। মসজিদের নীচের তলায় গ্যালারিতে বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ সহজেই চোখে পড়বে। এছাড়া রয়েছে গণেশ ও নটরাজের মূর্তি। চোখে পড়বে হিন্দুধর্মের অজস্র চিহ্নাবলীও। এইসব চিহ্ন কোনও মসজিদে তো দূর, কোনও সাধারণ ইসলামিক স্থাপত্যেই থাকা সম্ভব নয়। স্থানীয় জনজাতিরা আদিনা মসজিদকে কী চোখে দেখেন তার প্রমাণ একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে জানা যাবে। ১৯৩২ সালে জিতু সাঁওতাল মসজিদে ঢুকে লৌকিক মতে শিবপুজো শুরু করেন। তার দাবি ছিল, আদিনা মসজিদ যে জমিতে তৈরি করা হয়েছে তা প্রকৃত অর্থে শিবক্ষেত্র। একসময় এখানে আদিনাথের (শিবের) মন্দির ছিল। কোতোয়ালির মুসলমান জমিদার ব্রিটিশ পুলিশের সাহায্যে জিতু সাঁওতালকে হত্যা করেন।

সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি গৌড়ের হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাবার পথে গৌড়ের রামকেলিতে উপস্থিত হয়ে তৎসংলগ্ন তমাল বৃক্ষের তলায় অবস্থান করেন। তাঁর আগমন ও রামকেলিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিনে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ বৈষ্ণবদের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখনও সেই মেলায় দেশ বিদেশের হাজার হাজার বৈষ্ণবভক্তের সমাগম ঘটে। সেই সময় আলাউদ্দিন হুসেন শাহ গৌড়ের অধিপতি ছিলেন এবং গৌড়ের এক অংশের নাম হোসেনাবাদ রাখা হয়েছিল অর্থাৎ মুসলমান সম্রাটরা স্থানের নাম পরিবর্তন করেছিল। গৌড়ের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যে বেশ কিছু মিনার ও মসজিদে হিন্দু দেবদেবীর ভগ্ন মূর্তি ও মন্দিরের ইঁট পাথরের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ ছোটো সোনা মসজিদ ও ফিরোজ মিনার বা তুলসী মন্দির উল্লেখযোগ্য। ছোটো সোনা মসজিদে এক সময়ে সোনার পাতে মোড়া ছিল এবং এর দরদালান ও খিলান করা দরজায় পরিষ্কারভাবে ইঁট, পাথরগুলো যে হিন্দু দেবালয় হতে সংগৃহীত তা বোঝা যায়।

এছাড়া ফিরোজ মিনার বলে যে ৯০ ফুট উঁচু স্তম্ভটি গৌড়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রের মতে, এটি প্রহরী মন্দির। আবার কারো মতে, এই স্তম্ভে প্রদীপ জ্বালানো হতো বলে এটিকে চিরাগদানিও বলা হয়। আজও প্রতি বছর রামকেলি মেলার সময় ঐতিহ্য মেনে তীর্থযাত্রীরা এই ফিরোজ মিনার বা তুলসী মন্দিরে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকেন। এভাবে গৌড়ে অবস্থিত বিভিন্ন মসজিদ ও ধ্বংসাবশেষগুলোতে হিন্দু মন্দির এবং দেবদেবীর মূর্তির চিহ্ন খোদাই করা আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গৌড়ের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলোকে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মহিপুরের নিকট যে গুণমন্ত মসজিদটি সংরক্ষিত রয়েছে সেখানে মুসলমানরা ইদের সময়ে নমাজ পড়ে ও পুলিশ পাহারায় একশোর উপরে গো-হত্যা করে থাকে যা এক ঐতিহাসিক নিদর্শনস্থলকে কলুষিত করে চলেছে।

মালদা জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান গৌড়, আদিনা ও পাণ্ডুয়ার মতো আর একটি ঐতিহাসিক স্থান পাটলচণ্ডী বা পাতালচণ্ডী, গৌড় থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কথিত রয়েছে, প্রাচীন সেন বংশের কুলদেবী ছিলেন চণ্ডী। পাল বংশের রাজা দেবপাল তৎকালীন রামাবতীতে নিজের রাজধানী নির্মাণ করেন। অনেকে মনে করেন, সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেন রমাবতী থেকে দক্ষিণ দিকে নির্মাণ করেন নিজের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী। এই লক্ষ্মণাবতীই আজকের গৌড় বলে অনেকের ধারণা। ইতিহাসবিদ ড. তুষার কান্তি ঘোষ ও প্রদ্যুত ঘোষের রচনা থেকে জানা যায়, লক্ষ্মণাবতীর চারদিকে তিনি চারটি চন্ডী মন্দির নির্মাণ করেন। দক্ষিণ দিকের এই মন্দিরটির নামই হচ্ছে পাতালচণ্ডী। এছাড়া পূর্ব দিকে রয়েছে জহুরাচণ্ডী মন্দির আর পশ্চিমে দুয়ারবাসিনী মন্দির। উত্তরের চণ্ডী মন্দিরটি এখন আর নেই বলে গবেষক সুস্মিতা সোমের বই থেকে জানা যায়। অনেক ইতিহাসবিদদের ধারণা, সেন রাজারা এই ঐতিহাসিক পাতালচণ্ডী প্রচীনকালে গৌড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে করতেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে কার্জনের ভারত ভ্রমণের সময় গৌড়ের যে মানচিত্র তৈরি করেছিলেন তাতে পাতালচণ্ডীর উল্লেখ ছিল। তাঁর মতে, পাটলচণ্ডী দুর্গারই আর এক রূপ।

মালদহ থেকে কালিয়াচক অভিমুখে ৩৪নং জাতীয় সড়কের কাটাগড়ের কাছে ইংরেজ আমলের একটি নীলকুঠি রয়েছে যেটি এখনও নীলচাষিদের উপর ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনি মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এই প্রাচীন সৌধটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। সৌধটি গড়িয়া ইট বা ছোটো ছোটো ইট দিয়ে তৈরি হয়েছিল।

গৌড় নগরীর উপকণ্ঠে কালাপাহাড়ের গড় রয়েছে। বিশাল জলাশয় বেষ্টিত সুউচ্চ পাহাড়ের উপর ঐতিহাসিক পাতালচণ্ডী মন্দির পর্যটক দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এই জলাশয়টি এক সময়ে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং বড়ো বড়ো নৌকা এখানে নোঙর করা হতো। বড়ো বড়ো জাহাজ বাঁধার মোটা মোটা লোহার শিকল এখনো পাহাড়ের গায়ে ঝুলে রয়েছে। এখান থেকে খুব সহজেই গৌড়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সরকারি উদাসীনতা এতদিন এই ঐতিহাসিক পর্যটন স্থলটি অবহেলিত ছিল। ইদানিং পাকা রাস্তা ও মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে জেলা প্রশাসন এগিয়ে এসেছে। ভারতের মন্দিরময় নগরীর মধ্যে পাণ্ডুয়া একটি পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক হিন্দু নগরী। মালদা জেলার গাজোল থানার পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত প্রাচীন নগরীতে রয়েছে হিন্দু রাজাদের নির্মিত শিবমন্দির এবং ভালেশ্বরী দেবীর মন্দির। জনশ্রুতি গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেন পাণ্ডুয়াতে এইসব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

চীন পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নানা দেশ পরিভ্রমণ করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় পুণ্ড্রবর্ধন বা পাণ্ডুয়া এক সময়ে সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়েছিল। এখানে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব দেখা গেছে। পরবর্তীকালে মুসলমান আমলে পাণ্ডুয়ায় পির অর্থাৎ মুসলমান ফকিরের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। তৎকালীন বাদশাহরা এইসব ফকিরদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এদের মধ্যে একজনের নাম মখদুম শাহ জালালুদ্দিন মখদুম পির। এর নেতৃত্বে পাণ্ডুয়ার সমস্ত দেবালয় ধ্বংস হয়েছে এবং প্রধান হিন্দু দেবালয়ের স্থানে দরগা নির্মাণ করেছিলেন। সেই দরগার নাম বড়ো দরগা। প্রতিবছর এখানে মুসলমানদের নিয়ে একটি বড়ো মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এই পাণ্ডুয়াতেই আছে প্রাচীন হিন্দু রাজাদের নির্মিত শিব ও ভালেশ্বরী দেবীর মন্দির। মন্দিরের হিন্দু নিদর্শনের কিছু কিছু অংশ ক্রমাগত ভাঙচুর করে বর্তমানে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে থেকে পাকা দেওয়ালে এখনও দেখা যায় সেইসব ক্ষতবিক্ষত হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। শিবলিঙ্গ, ত্রিশূল, শঙ্খ, মাটির প্রদীপ প্রভৃতি। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়, মন্দিরের ভিতরে একটি লোহার সিন্দুকে দুটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ দুটির একটি ছিল তালপাতায় লিখিত এবং আরেকটি ছিল কাগজে লিখিত। লোহার সিন্দুকটি বর্তমানে থাকলেও রহস্যজনকভাবে বই দুটির কোনো হদিস নেই।

মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালা পূজার্চনা করবার ব্যবস্থা ও প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই এখানে চলে আসছিল। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এখানে মহা শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে শিবের মাথায় জল ঢালা ও পূজার্চনা করবার প্রচলন ছিল। তখন হিন্দু রীতি মেনেই মেলার আরম্ভ করা হতো। পাণ্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুতুবপুর গ্রামের শ্রী হুদু মণ্ডল মন্দিরের শেষ পূজারি ছিলেন। যদিও তিনি মারা গেছেন কিন্তু তাঁর পুত্র কালাচাঁদ মণ্ডল ও অন্যান্য প্রতিবেশীরা এখনও শিবের মাথায় জল ঢালার কথা মনে করে পুলকিত বোধ করেন। এখন পাণ্ডুয়া মেলায় গেলে দেখা যায় যথেচ্ছভাবে গো-মাংস ও হাড় পরে রয়েছে। আসলে যাতে করে হিন্দুরা এই মেলায় না যেতে পারে তাই পাড়ুয়ার হিন্দু মন্দিরকে পুরোপুরি কুক্ষিগত করে মসজিদে রূপান্তরিত করার মতলব করা হচ্ছে।

ঐতিহাসিক তুষার কান্তি ঘোষের পুস্তক থেকে জানা যায়, ১৯৫৯ সালে তিনি নিজে ছাত্রদের নিয়ে আদিনায় সাইকেল ট্রিপ করতে গিয়ে পাণ্ডুয়া দরগায় ভালেশ্বরী মন্দিরের ভগ্নস্তূপ খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। তায়েবজির আদেশে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ভালেশ্বরী দেবীর মন্দির। কিছুদিন আগেও সেই ধ্বংসাবশেষ ছিল। এখন তার চিহ্নমাত্র নেই বলে দুঃখ করছিলেন তুষারবাবু। তাঁর কথায়, কারা মুছে দিয়ে পাণ্ডুনগরীর শেষ চিহ্নটিকে, তা সবাই জানে। বর্তমানে পাড়ুয়া ও সন্নিহিত এলাকার পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ ও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। এই এলাকায় কয়েক বছর আগে পাঁচতলা মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে। যেখান থেকে জেহাদি সংগঠনের কাজ চলছে।□

ত্রিবেণীতে বিষ্ণুমন্দির ভেঙে মসজিদ

হুগলীর ত্রিবেণীতে জাফর খান গাজির কবরে আরবিতে লেখা শোকলিপি পাঠ করেছিলেন ব্রিটিশ অফিসার এইচ বালোচম্যান। লেখাটির অর্থ এইরকম : 'জাফর খান সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করে বাঙ্গলার বহু নগর ধ্বংস করেন এবং অধিকৃত অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ করেন। যেসব হিন্দু জাফর খানের কথায় ধর্মত্যাগ করে মুসলমান হতে চাননি তাদের তিনি নির্মমভাবে হত্যা করেন। এবং তাদের সম্পদ লুঠ করে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। ...কাফেরদের (হিন্দুদের) হত্যা করার জন্যেই তাকে গাজি উপাধি দেওয়া হয়। জাফর খান ত্রিবেণীতে যে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন, সেটি একটি বিষ্ণুমন্দির (মুরারীমোহন) ধ্বংস করে করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তবে অভিযোগটি যে ভিত্তিহীন নয় তার প্রমাণ মিলবে মসজিদের প্রবেশ দ্বারের হিন্দু স্থাপত্যরীতিতে। দেওয়াল ও স্তম্ভনির্মাণেও রয়েছে হিন্দু স্থাপত্যের ছোঁয়া। ১৮৪৭ সালে আরেক ব্রিটিশ অফিসার ডি. মনি যখন ত্রিবেণীতে জাফর খান গাজির মসজিদে যান, তখন মসজিদের (আল্লাহের) কয়েকজন বন্দা (খাদিম) তাকে কিছু কাগজপত্র দেয়। সেইসব দলিল পরীক্ষা করে তিনি জানতে পেরেছিলেন, জাফর খান এবং তার ভাইপো শাহ সুরি ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিম ভারত থেকে এসেছিলেন। ত্রিবেণীর রাজা ভূদেবকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন। 'রাজা ভূদেব ইসলাম গ্রহণে সম্মত হননি, মস্তকচ্ছেদন করে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর বহু হিন্দুকে জাফর খান গায়ের জোরে ধর্মান্তরিত করে। যারা রাজি হয়নি তাদের হত্যা করা হয়।

মুর্শিদাবাদের দেবদেউল ও কাটরা মসজিদের ইতিকথা

বিনয়ভূষণ দাশ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙ্গলায় সেন-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুযুগও শেষ হয়। ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ খিলজির বাঙ্গলা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মুসলমান শাসনের প্রসার ঘটে সমগ্র বাঙ্গলায়। গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগ অবধি কালপর্বে স্থাপত্য শিল্পে সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের যে ধ্রুপদী রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও সমুজ্জ্বল ছিল তার গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ল। প্রাচীন বাঙ্গলার প্রত্নসম্পদ ও গৌরব। সু-উচ্চ শিখরযুক্ত মন্দির ও দেবদেউলগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে সেই ধ্বংসাবশেষ দিয়ে দুশো বছরের সুলতানি শাসনে ব্যাপকভাবে মসজিদ ও মাজার তৈরি করাই ছিল মুসলমান শাসকদের মূল লক্ষ্য। অপূর্ব দেবমূর্তিগুলি ভেঙে তার অবশিষ্ট অংশে আরবি ফারসি লিপিতে মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হলো। হুগলীর পাণ্ডুয়া ও ত্রিবেণী, মালদহের গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় নির্মিত হলো বিরট বিরাট সব মসজিদ ও কবরসৌধ। গৌড়-লক্ষ্মণাবতীর সুবিশাল প্রাসাদ ও মন্দিরাদি ধ্বংস করে সেগুলি দিয়ে পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের রাজধানী এবং সুবিশাল আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়। আদিনা মসজিদ তো সম্পূর্ণভাবে হিন্দু মন্দিরের অবশেষ থেকে তৈরি করা হয়েছিল। এই মসজিদের তিনটি কারুকার্যখচিত স্তম্ভই হিন্দু সৌধ থেকে নেওয়া। পার্সি ব্রাউন তঁর Indian Architecture (Islamic Period) গ্রন্থে বলেছেন, 'The Adina Mosque presents a certain grave and stately dignity...None of the stone work is original, it was all stripped from pre-existing Hindu structures at Lakhnauti in its and places 'immediate neighbourhood' ওই পুস্তকে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, 'Many temples and places appear to have been dismantled to provide the amount of stone required and it is not improbable that the finest monuments of the Hindu capital of Lakhnauti were demolished in order to produce this one Mohammedan mosque.' প্রখ্যাত মন্দির বিশেষজ্ঞ প্রণব রায় তাঁর 'বাঙ্গলার মন্দির- স্থাপত্য ও ভাস্কর্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'বিজয়ী মুসলমান শাসকদের দ্বারা হিন্দুমন্দির ধ্বংসকর্ম অন্তত খ্রি. পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত চলে। সুন্দর সুন্দর দেব-দেবী মূর্তিগুলি ভগ্ন করে নদী বা দীঘিতে নিক্ষিপ্ত করা হয়।' বাঙ্গলায় মুসলমান আগমনের প্রথম যুগে, সুলতানি আমলে হুগলী জেলা অঞ্চলে এবং গৌড়-মালদহে এই ধ্বংসাত্মক অভিযান বেশি চলে। কিন্তু মোগল সুবেদারদের আমলে, বাঙ্গলার নবাবি আমলে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ধ্বংসের বিস্তার ঘটে, ছড়িয়ে পড়ে মুর্শিদাবাদ জেলা অঞ্চলে। ১৭০৪ সালে করতলব খাঁ (পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলি নামে পরিচিত) তাঁর দেওয়ানি দপ্তর ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করে। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'কালাপাহাড়ি' ধ্বংসের নির্মম হাত এসে পড়ে এই অঞ্চলে। বাঙ্গলার অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেও তার সমস্ত চিহ্ন লোপাট করতে পারেনি ধ্বংসকারীর নির্মম হাত, মাঝে মাঝেই তার চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এখানে সেখানে। কিন্তু মুর্শিদাবাদে

নবাবদের, তাঁদের সাগরেদদের ধ্বংসের হাত আরও নিপুণ, আরও তীক্ষ্ণ! কোনো চিহ্নও রেখে যায়নি— কোনো চিহ্নের লেশমাত্র নেই সেই বিপুল সংখ্যক ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিররাজির। মুর্শিদাবাদে আসীন বাঙ্গলার প্রথম নবাব জন্মসূত্রে ছিলেন হিন্দুব্রাহ্মণ; ধর্মান্তরিত মুসলমান। আরেক জন্মসূত্রে হিন্দুব্রাহ্মণ কালাপাহাড়ের মতোই তিনি হিন্দুমন্দির ধ্বংস ও হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে ছিলেন নির্মম। ফলে মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমান যুগের আগেকার কোনো হিন্দু মন্দিরের চিহ্নমাত্র নেই। জেলায় যে মন্দিরগুলির অস্তিত্ব এখনও টিকে আছে তা সবই নির্মিত হয়েছে নবাবি আমলের একেবারে শেষ দিকে; অথবা ইংরেজ কোম্পানির রাজত্ব শুরু হবার পরে। রাজধানী মুর্শিদাবাদে তো হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র মন্দির আছে যা সবই ইংরেজ রাজত্বে নির্মিত। সাহানগর বা রেজিস্ট্রি অফিসের উত্তরের মন্দিরটির মতো দু-একটি মন্দির যা ইংরেজ রাজত্বে নির্মিত। অথচ এমন তো হবার কথা নয়। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দের আগে থেকেই কুলোরিয়া বা বর্তমান মুর্শিদাবাদ একটা টাঁকশল শহর হিসেবে বহুল পরিচিত ছিল। এ শহর যার নামে মুকসুদাবাদ নামে পরিচিত ছিল সেই নানকপন্থী সাধক মুকসুদন দাসের আখড়া ছিল এখানে; ছিল তার অজস্র শিষ্যদের বাসস্থান। হিন্দুপ্রধান জনবসতি ছিল স্থানটি। স্বাভাবিকভাবেই এখানে অনেক হিন্দু মন্দির ও আখড়া ছিল। রাজধানী হওয়ার কারণে এখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাজকর্মচারী ও জমিদারদের অথবা তাঁদের প্রতিনিধিদের আসাযাওয়া লেগেই থাকত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, রাজধানী মুর্শিদাবাদের চৌহদ্দির মধ্যে নবাবদের রাজত্বের আগেকার কোনো মন্দির, দেবালয় নেই। তাহলে মুসলমানপর্বে হিন্দু আমলের মন্দিরগুলি গেল কোথায়? এই প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস গবেষক তথা ক্ষেত্র সমীক্ষক বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মুর্শিদাবাদের মন্দির' গ্রন্থে লিখেছেন, 'কর্ণসুবর্ণ থেকে একটি প্রাচীন পথ গোকর্ণ, মহালন্দী প্রভৃতি অতিক্রম করে সাগরদীঘিতে ত্রিধা বিভক্ত হয়ে প্রথমটি মহীপাল, দ্বিতীয়টি পইকর (বীরভূম) ও তৃতীয়টি মণিগ্রাম ও চাঁদপাড়া হয়ে গৌড়ের দিকে প্রসারিত ছিল। ওই সকল পথের ধারে প্রথম মুসলমান আক্রমণের ও ধ্বংসলীলার নানা নিদর্শন দেখা যায়।' উদ্দিষ্ট

কাটরা মসজিদের নির্মাণও সন্দেহজনক

মুর্শিদাবাদে কাটরা মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। মুর্শিদকুলি সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি ছিলেন হিন্দু। পরে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন। কাটরা মসজিদ নির্মাণের ভার তিনি দিয়েছিলেন মুরদ ফারাশ খানকে। ফারাশ খান ছিলেন চরম হিন্দুবিদ্বেষী। অভিযোগ, তিনি বহু মঠমন্দির এবং বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করে তার মালমশলায় নির্মাণ করান মসজিদ। স্থানীয় হিন্দুরা এমন অভিযেগও করে থাকেন যে, আজ যেখানে কাটরা মসজিদ এক সময় সেখানে বিশাল শিবমন্দির ছিল। ফারাশ খান সেই মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করান। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সীতারাম গোয়েলও বাঙ্গলায় যেসব মসজিদ কোনও মন্দির বা বৌদ্ধ বিহার ভেঙে তার মালমশলার সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল— সেই তালিকায় কাটরার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এই পথে পড়ে গোকর্ণ গ্রাম, হিন্দুরা মুসলমানদের এই ধ্বংসলীলার সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তাঁদের দেবালয় ও দেবমূর্তিসকল রক্ষা করতে পারেনি। মুসলমান সৈন্যের কালাপাহাড়ি হাত চেষ্টা করেছে দেবমূর্তিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে, কিন্তু সবসময় তা করে উঠতে পারেনি। ফলে দেবমূর্তিসমূহ কখনো বা ভাঙা অবস্থায় কখনও বা আস্ত অবস্থায়ই নিকটবর্তী দীঘি বা পুকুরে নিক্ষেপ করেছে। পরবর্তীকালে দীঘি উৎখনন বা ভরাট পুকুর সংস্কার করতে গিয়ে ওই মূর্তিগুলি অনেকক্ষেত্রেই পাওয়া যাচ্ছে। গোকর্ণ গ্রামের নৃসিংহদেবের মন্দির ধ্বংস করে মন্দিরের নৃসিংহদেবের বিগ্রহ সম্ভবত বেশ কিছুটা দূরের বহরুলের 'নৃসিংহ দীঘিতে' নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। প্রায় পৌনে তিনশো বছর পরে ওই দীঘিতে অকস্মাৎ ওই দেবমূর্তিটি পাওয়া যায়। মূল মন্দিরে প্রাপ্ত উল্লিখিত মূর্তির বিবরণ প্রাপ্ত মূর্তির সঙ্গে মিলে যাওয়ায় জনৈক রামচন্দ্র মূর্তিটি এনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং পুরাতন ভিতের উপরে মন্দিরটিও পুনর্নির্মাণ করেন। তবে মুর্শিদাবাদের বেশিরভাগ মন্দিরের ক্ষেত্রে এই সৌভাগ্য ঘটেনি। সেগুলির ইতিহাস সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে। আগেই বলেছি, মুর্শিদাবাদ শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। যে সকল হিন্দু ও জৈন মন্দির মুর্শিদাবাদ শহরের উপকণ্ঠে দেখা যায় তার মধ্যে কিরীটেশ্বরী ও রাধামাধব মন্দির বাদে আর সমস্ত মন্দিরেরই নির্মাণকাল পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের, ইংরেজ রাজত্বের সময়কার। ওই দুটি মন্দির মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে মূলত নবাব দরবারের প্রভাবশালী অমাত্য ও রাজকর্মচারীদের সংস্পর্শের কারণে এবং রাধামাধব মন্দিরের এক অলৌকিক ঘটনার মাহাত্ম্যে। কিরীটেশ্বরী মন্দিরের সঙ্গে বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা রামকৃষ্ণ প্রমুখ অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজকর্মচারীদের যোগাযোগ থাকার কারণে নবাবের অধস্তন কর্মচারী মোরাদ ফরাস, নাজির আহমেদ বা মুর্শিদকুলি খাঁর নাতজামাই সৈয়দ রেজা খাঁর সাহস হয়নি এই দুটো মন্দিরে হাত দেবার।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হলে তিনি তার ওই অধস্তন কর্মচরীদের একটি মসজিদসহ স্মৃতিসৌধ, একটি বাজার বা কাটরা নির্মাণের আদেশ দেন, তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয় ওই পূর্বোক্ত মোরাদ ফরাসের উপর। সে নবাব প্রাসাদের পূর্বপ্রান্তে, খাস তালুকের মধ্যে একটি স্থান স্থির করে। যেহেতু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই স্মৃতিসৌধ এবং মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল; সেই জন্য নির্মাণের মালমশলা জোগাড় করা অসম্ভব ছিল ওই অল্প সময়ে। এর আগেই অবশ্য মন্দির ভাঙাতে হাত পাকিয়েছিল নবাবের ওই কর্মচারীরা। মুর্শিদকুলি খাঁর হিন্দু-বিদ্বেষ কারো কাছে গোপন ছিল না। তাঁর সময়ে অথবা

ফঃ ৪

মুর্শিদকুলির আক্রোশ থেকে রক্ষা পেয়েছিল কিরীটেশ্বরী মন্দির। (মন্দির তখন, এখন)

পরবর্তীকালেও রাজধানী মুর্শিদাবাদ বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোনে মন্দির নির্মাণ করতে দেওয়া হতো না। সুতরাং নবারের আদেশ এবং অনুমোদনে নির্মাণসামগ্রী সংগ্রহের জন্য শুরু হলো হিন্দুমন্দির ভাঙা। রাজধানী মুর্শিদাবাদ এবং সেখানে থেকে চারদিনের হাঁটাপথে যত মন্দির ছিল সবই নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হলে— বাদ দেওয়া হলো কেবল ওই দুটি মন্দির। ধ্বংস করে দেওয়া মন্দির থেকে প্রাপ্ত উপকরণ থেকে মাত্র এক বছরের মধ্যে মুর্শিদকুলির জন্য সমাধিভবন-সহ বিশাল কাটরা মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ করল মোরাদ ফরাস। নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় ১৭২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে। কাটরা মসজিদের বিভিন্ন অংশের গড়ন ভালো করে লক্ষ্য করলে এটা ভালোই বোঝা যায় যে এর নির্মাণের উপাদানগুলি হিন্দুমন্দির থেকে সংগৃহীত। মুর্শিদাবাদ গবেষক বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (আইএএস) লিখিত 'পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ— মুর্শিদাবাদ' গ্রন্থে লিখেছেন। 'সময়াভাবে মুর্শিদাবাদ শহরের আশপাশের সমস্ত হিন্দু-মন্দির ভেঙে নাকি প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল।' সমস্ত ঐতিহাসিক এবং লেখকই এই তথ্য সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। 'তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ'তে মুসলমান ঐতিহাসিক মুন্সী সলিমুল্লাহ লিখেছেন, 'He pulled down all the neighbouring Hindoo temples, and used the materials for raising the new work; the zemindars and other Hindoos, would have preserved their temples at any price; but no intreaties or brides could prevail : not one was was left standing in Moorshedabad, or at the distance of four day's journey from it." (pp.121-22). এই একই কথা লিখেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ারট তাঁর ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই The History of Bengal-এ।

এই ঘটনার সত্যতা মেলে পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দিন খাঁর সিদ্ধান্তে। সুজাউদ্দিন খাঁ মুর্শিদকুলি নিয়োজিত ওই দুই কর্মচারী, মোরাদ ফরাস ও নাজির আহমেদের অপরাধের বিশেষরূপে অনুসন্ধান করে, বিচার করে ওই অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। □

মন্দির ভেঙে সেইজায়গায় মসজিদ
অথবা
অন্য কোথাও মন্দির ভেঙে সেই মালমশলায় মসজিদ নির্মাণ

মালদহ

গঙ্গারামপুর

১। বর্তমান শাহ আটার দরগার জমিতে আগে শিবমন্দির ছিল।

২। নদীর ধারে তৈরি মসজিদের জায়গায় ১২৪৯ সালের আগে মন্দির ছিল।

গৌড়

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে হিন্দু গৌড়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী ধ্বংস করে তৈরি হয়েছিল এক ইসলামিক নগর। নীচে দেওয়া মিনার/ মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল বহু হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

১। ছোটো সোনা মসজিদ।

২। কদম রসুল মসজিদ।

৩। তাঁতিপাড়া মসজিদ।

৪। লোটন মসজিদ।

৫। বড়ো সোনা মসজিদ।

৬। মখাদাম আখি সিরাজ চিস্তির দরগা।

৭। দরসবারি।

৮। শাহ নিয়ামাতুল্লার আস্তানা।

৯। চামকাট্টি মসজিদ।

১০। চিকা মসজিদ ইত্যদি।

মালদা

১। জামা মসজিদ।

২। শাকমোহন মসজিদ।

পাণ্ডুয়া

লক্ষ্মণাবতীর ধ্বংসস্তুপের ওপর তৈরি হয়েছিল পাণ্ডুয়া শহরও। স্বাভবিক ভাবেই এই শহরে যেসব মসজিদ/দরগা/মিনার তৈরি হয়েছিল তার সঙ্গেও জড়িয়ে আছে মন্দির ধ্বংসের ইতিহাস। এমনই কয়েকটি বিতর্কিত নির্মাণ—

১। আদিনা মসজিদ।

২। একলাখি মসজিদ।

৩। ছে' হাজারি দরগা।

৪। সোনা মসজিদ।

৫। কদম রসুল ইত্যাদি।

মুর্শিদাবাদ

চুনাখালি

১। বারবাক কি মসজিদ— আগে মন্দির ছিল।

মুর্শিদাবাদ

১। কাটরা মসজিদ।

২। সাঙ্গি দালান।

৩। মহাল সারা।

৪। আলিবর্দি খানের মসজিদ।

৫। হাজারদুয়ারি প্যালেস।

(সূত্র : বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সীতারাম গোয়েলের গ্রন্থ, দা হিন্দু টেম্পলস : হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দেম)

শিক্ষক সঙ্ঘের নদীয়া জেলা সম্মেলন

গত ২৯ ডিসেম্বর বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের নদীয়া জেলার দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনে রাজ্য কমিটির সম্পাদক নিশীথ বিশ্বাস বলেন, রাষ্ট্রের হিতে এই শিক্ষক সঙ্ঘ কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন একমাত্র জাতীয়তাবাদী শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই সুনাগরিক নির্মাণের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছ সমাজ এবং পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র নির্মাণ সম্ভব। তিনি বলেন বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ শিক্ষকদের সীমাহীন বেতন বঞ্চনার প্রতিবাদে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের রাজ্য কমিটির সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কানুপ্রিয় দাস, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া বিভাগ প্রচারক কর্ণধর দে এবং নদীয়া জেলার কার্যবহ সুকান্ত দত্ত।

নবদ্বীপে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গীতা মহাযজ্ঞ

গত ১৩ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সামাজিক সমরসতা অভিযান, নবদ্বীপ নগর সমিতির দ্বারা গীতা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক সন্ত, মহন্ত উপস্থিত ছিলেন। ইসকন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রিষড়া প্রেম মন্দির, বন্ধু গৌরব মহারাজ-সহ অনেক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ও সময়োপযোগী বক্তব্য উৎসবের গরিমা বৃদ্ধি করে। ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার উদ্বোধনী বক্তব্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাজকে এ যুগে করার দায়িত্ব বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কীভাবে করছে তা তুলে ধরেন।

সব মিলিয়ে হাজার ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। পরদিন গরিবদের মধ্যে ২০০ কম্বল বিতরণ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জে পরিবার প্রবোধন সম্মেলন

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ রবিবার বিকেল ৩-৩০ মিনিটে এক ভব্য পরিবেশে উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ শহরে সরস্বতী শিশু মন্দিরে পরিবার প্রবোধনের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর স্থান অলংকৃত করেন শহরের বিশিষ্ট নৃত্য শিক্ষিকা শ্রীমতী তাপসী ব্যানার্জি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা কার্যবাহ দেবাশিস দাস ও জেলা পরিবার প্রবোধন সংযোজক শুভাশিস সাহা। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৫ জন মা-সহ ৪০ জন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। পরিবার প্রবোধনের কাজ কী, কীভাবে সমাজের বিভিন্ন গৃহে তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার করা যায় ও সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যেভাবে আমাদের গ্রাস করছে ও সেখান থেকে কীভাবে নিজেদের স্বদেশ ভাবনায় ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন সঙ্ঘের প্রচারক তথা উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল।

রথীন্দ্রমঞ্চে শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান

কলকাতার প্রখ্যাত সামাজিক ও সাহিত্যিক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে গত ২০ ডিসেম্বর কলকাতার রথীন্দ্রমঞ্চে 'ভারতীয় সংবিধানে অঙ্কিত চিত্রের পটভূমি ও ভাবার্থ' বিষয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট আয়কর পরামর্শদাতা সজ্জন তুলসীয়ান এবং প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন উক্ত বিষয়ে গ্রন্থপ্রণেতা লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। অনুষ্ঠান শুরু হয় জনপ্রিয় গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্রের কণ্ঠে 'প্যারা হিন্দুস্থান হমারা' ভারতবন্দনা দিয়ে। রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভারতীয় সংবিধানে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে সংবিধান প্রণেতাদের দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করার অধিকার কারো নেই। লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা বলেন, সংবিধানে অঙ্কিত চিত্রগুলি ভারতবর্ষকে প্রতিবিম্বিত করছে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার সম্পাদক মহাবীর বজাজ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সাহিত্য সম্পাদক বংশীধর শর্মা। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতাজয়ন্তী পালন

সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে মালদাবাসী যখন বড়দিন উদযাপনে ব্যস্ত তখন গৌড়বঙ্গ মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ এই অতিমারী পরিস্থিতির মঙ্গল কামনায় বিশ্বশান্তির জন্য ২৫ ডিসেম্বর একদিবসীয় আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল গীতাজয়ন্তী আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভার প্রধান বক্তা ছিলেন— সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. অজিত কুমার মণ্ডল। অনুষ্ঠান ব্রহ্মনাদ উচ্চারণের মাধ্যমে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. বিজয় ঘোষ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অতঃপর বিভাগীয় ছাত্রী অঙ্কনা সাহার সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচিত হয়। বিভাগীয় অধ্যাপক মানিক হালদার মানব জীবনে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য গীতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন। এছাড়াও অধ্যাপক রাজেশ্বর চৌধুরী, প্রভাকর সাহা, অমিতলাল ঠাকুর এবং অধ্যাপিকা তানভি পারভিন সমাজজীবনে গীতার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বলেন। উক্ত আলোচনা সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় হতে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অধ্যাপক ড. অজিত কুমার মণ্ডল বলেন, গীতা আমাদের জীবনদর্শন, আমরা মোক্ষলাভ করতে পারি গীতাপাঠের মাধ্যমে। বিভাগীয় ছাত্র অজয় মণ্ডল বলেন বিভিন্ন অজানা তথ্য জেনে সমৃদ্ধ হলাম।

তেহট্টে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের সভা

সঙ্ঘবদ্ধতাই শক্তির মূল উৎস। কথায় বলে— 'যার দল নেই, তার বল নেই'। সেই দল তৈরিতে নেমে পড়েছে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ। নদীয়া জেলা জুড়েই অন্নদাতা কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কার্যকর্তারা। পাশাপাশি কৃষকদের বিভিন্ন প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা এবং দাবি-দাওয়া নিয়েও কাজ করে চলেছেন তারা। আজ তেমনই একটি কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের তেহট্ট-১ ও তেহট্ট-২ বিকাশ খণ্ডের পক্ষ থেকে। সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায়, নদীয়া জেলা সভাপতি ডাঃ সন্দীপ কীর্তনীয়া, জেলা সহ-সভাপতি অধ্যাপিকা সুচেতা মুখার্জি, জেলা সম্পাদক মিলন খামারিয়া, সহ-সম্পাদক বিভাস মোদক, অর্ণবদেব চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও কৃষি বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত উদ্যানবিদ ড. ব্যাসদেব চট্টোপাধ্যায়, পতঙ্গ বিশারদ ড. সন্তোষ রায় ও আশিস সরকার। আজকের সভার সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আইনজীবী অনিকেত জোয়ারদার।

আজকের সভাতে বিশিষ্ট উদ্যানবিদ ড. ব্যাসদেব চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন অর্থকরী ফসল, যেমন একাঙ্গী, ড্রাগন ফল, মাল্টা ফল ইত্যাদি ও ঔষুধি গাছের চাষ করার জন্য কৃষকভাইদের উৎসাহিত করেন। প্রখ্যাত পতঙ্গবিদ ড. সন্তোষ রায় জৈবিক উপায়ে কীটপতঙ্গ কীভাবে নাশ করা যায়, সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানান এবং বিশিষ্ট কৃষিবিদ আশিষ সরকার ভারত সরকারের 'কৃষি আইন (২০২০)' সম্পর্কে চাষিভাইদের সচেতন করেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের 'Farmer Producer Organization (FPOs)' গঠনের প্রক্রিয়া, নির্দেশিকা ও কৃষকদের সুবিধার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

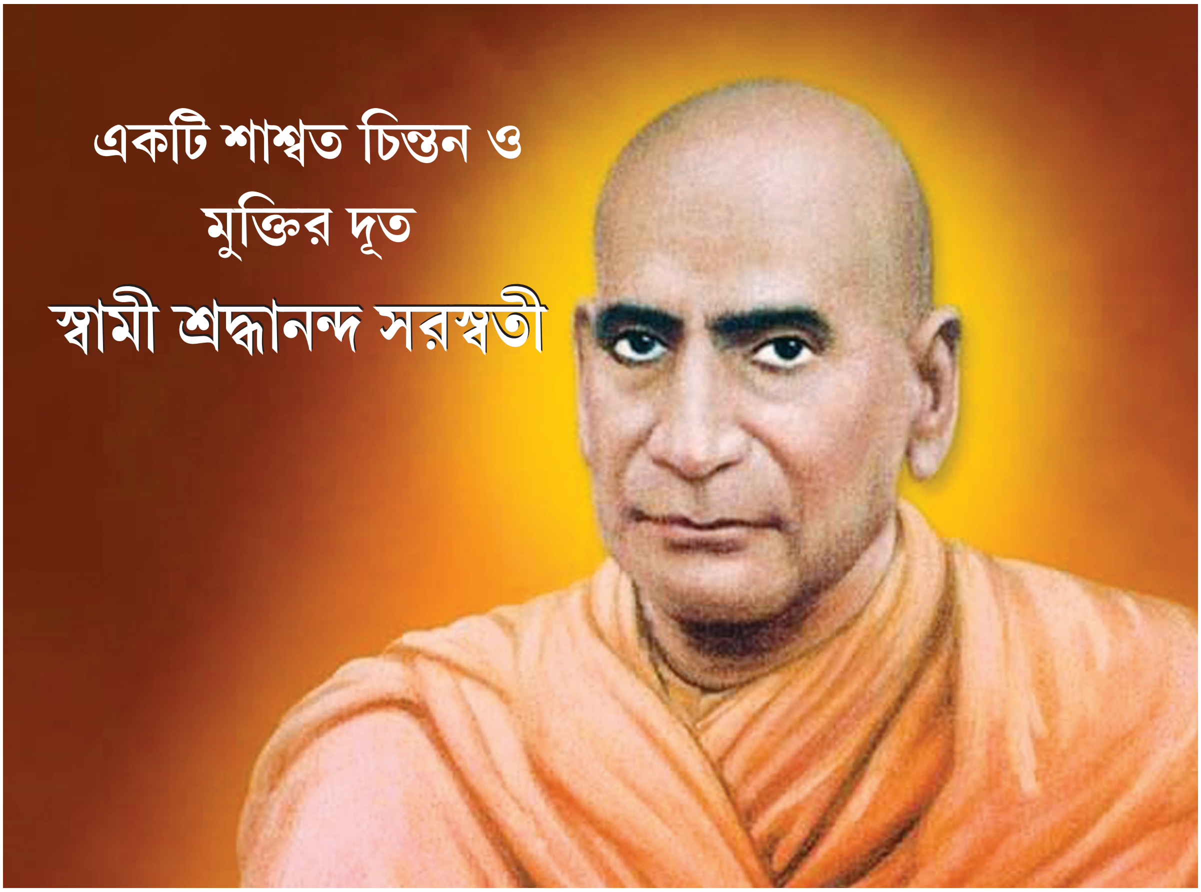

একটি শাশ্বত চিন্তন ও মুক্তির দূত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী

সৌমিত্র সেন

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী (মুন্সিরাম বিজ; ফেব্রুয়ারি ২২, ১৮৫৬— ডিসেম্বর ২৩, ১৯২৬) একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ, মুক্তিযোদ্ধা এবং আর্যসমাজের সন্ন্যাসী যিনি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর শিক্ষার প্রচার করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের মহান দেশপ্রেমিক তপস্বীদের অন্যতম পথিকৃৎ, যিনি নিজের জীবন স্বাধীনতা, স্ব-শাসন, শিক্ষা এবং বৈদিক ধর্মের প্রচারের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি গুরুকুল কাংগরী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ১৯২০-এর দশকে হিন্দু সমাজ ও ভারতকে সংগঠিত করতে এবং শুদ্ধি আন্দোলন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ড. ভীমরাও আম্বেদকর ১৯২২ সালে বলেছিলেন যে শ্রদ্ধানন্দ হলেন অস্পৃশ্যদের 'সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যিকারের মহান মানব'।

প্রথম জীবন :

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (মুন্সিরাম বিজ) পঞ্জাব প্রদেশের জলন্ধর জেলার তালওয়ান গ্রামে একটি ক্ষত্রিয় পরিবারে ১৮৫৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুনের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা, নানাকচাঁদ বিজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা শাসিত ইউনাইটেড প্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) পুলিশ অফিসার ছিলেন। তাঁর শৈশবের নাম বৃহস্পতি বিজ এবং মুন্সিরাম বিজ ছিল, তবে মুন্সিরাম তাঁর সরলতার কারণে আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বাবা বিভিন্ন জায়গায় বদলি হওয়ায় তাঁর প্রাথমিক পড়াশোনা ভালোভাবে করা সম্ভব হয়নি। লাহোর ও জলন্ধরই ছিল তাঁর প্রধান কাজকর্মের ক্ষেত্র। একবার আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক ধর্মের প্রচারের জন্য বরেলিতে পৌঁছেছিলেন। পুলিশ অফিসার নানকচাঁদ বিজ তাঁর পুত্র মুন্সিরাম বিজ-সহ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর বক্তৃতায় পৌঁছেছিলেন। বয়ঃসন্ধি অবধি মুন্সিরাম বিজ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেননি। তবে স্বামী দয়ানন্দজীর যুক্তি ও আশীর্বাদ মুন্সীরাম বিজকে ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং বৈদিক ধর্মের এক নিবেদিত ভক্ত করে তুলেছিল।

সমাজসেবা :

তিনি একজন সফল আইনজীবী হয়েছিলেন এবং যথেষ্ট নাম ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর জনজীবন শুরু হয়েছিল আর্য সমাজ জলন্ধর জেলা সভাপতি পদ দিয়ে। তিনি আর্য সমাজে খুব সক্রিয় ছিলেন। মহর্ষি দয়ানন্দের দুর্দান্ত যাত্রারা পরে তিনি স্বদেশ, স্ব-সংস্কৃতি, স্ব-সমাজ, স্ব-ভাষা, স্ব-শিক্ষা, মহিলা কল্যাণ, দলিত উন্নয়ন, স্বদেশী প্রচার, ভণ্ডামি, কুসংস্কার ও ধর্ম নির্মূলের কাজে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তিনি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত হয়েছিলেন। গুরুকুল কাংরি প্রতিষ্ঠা, অস্পৃশ্যতা, শুদ্ধি, পত্রিকা দ্বারা ধর্ম প্রচার, সত্য ধর্মের ভিত্তিতে সাহিত্যের সৃষ্টি, বেদের পাঠ ও শিক্ষার ব্যবস্থা, ধর্মের পথে লেগে থাকা, আর্য ভাষা প্রচার ও জীবিকার ভাষা বানানো আর্যদের সফল প্রচেষ্টা, আর্য বর্ণের অগ্রগতির

জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা ইত্যাদি হলো সেই কাজ যার দ্বারা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সর্বকালের জন্য অমর হয়েছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল শ্রীমতী শিব দেবীর সঙ্গে। ১৯১৪ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামে পরিচিত লাভ করেন। ১৯০১ সালে মুন্সিরাম বিজ ব্রিটিশদের দ্বারা জারি করা শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে বৈদিক ধর্ম ও ভারতীয়ত্ব শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান 'গুরুকুল' প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুকুল বিদ্যালয়টি হরিদ্বারের কাংরি গ্রামে খোলা হয়। বর্তমানে এটি 'গুরুকুল কাংরি বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি সাম্মানিক বিশ্ববিদ্যালয়। সেই দিনগুলিতে গান্ধীজী আফ্রিকাতে লড়াই করছিলেন। মহাত্মার সংগ্রামে সাহায্যের জন্য মুন্সিরাম গুরুকুলের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১৫০০ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন এবং এটি গান্ধীজীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। গান্ধীজী আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসে গুরুকুলের কাছে পৌঁছে মহাত্মা মুন্সিরাম বিজ এবং দেশপ্রেমিক শিক্ষার্থীদের সামনে মাথা নত করেছিলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীই গান্ধীজীকে প্রথমে মহাত্মা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং অনেক আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি ভবিষ্যতে খুব মহান হয়ে উঠবেন। সাংবাদিকতা এবং হিন্দি- সম্পাদনা পরিষেবার পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকতায়ও সাহসী হয়েছিলেন। তিনি উর্দু ও হিন্দি ভাষায় ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। পরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর অনুসরণ করে তিনি দেবনাগরী লিপিতে রচিত হিন্দিকে অগ্রাধিকার দেন। তাঁর চিঠি 'স্বধর্ম প্রচারক' প্রথম উর্দুতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে পরে তিনি উর্দুর পরিবর্তে দেবনাগরী লিপিতে রচিত হিন্দিতে এটি বের করতে শুরু করেছিলেন। এতে তাদের আর্থিক ক্ষতিও হয়েছিল। তিনি হিন্দিতে 'অর্জুন' ও উর্দুতে 'তেজ' দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। জালিয়ানওয়ালার ঘটনার পরে কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশন (১৯১৯ ডিসেম্বর) অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্বাগত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিন্দিতে তাঁর বক্তৃতা করেছিলেন এবং হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলন :

তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবলভাবে অংশ নিয়েছিলেন। দরিদ্র ও নিপীড়িতদের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। নারী-শিক্ষার প্রচার করেছেন। ১৯১৯ সালে, দিল্লির জামে মসজিদ অঞ্চলে আয়োজিত বিশাল সমাবেশে স্বামীজী ভারতের স্বাধীনতার জন্য সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ভুলে প্রত্যেক নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

শুদ্ধিকরণ :

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধিকরণ আন্দোলনে কংগ্রেসের কিছু বিশিষ্ট নেতানেত্রীকে যখন 'মুসলমান তুষ্টির মারাত্মক নীতি' অবলম্বন করতে দেখেন, তখন তিনি অনুভব করেছিলেন যে এই নীতিটি জাতির এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হবে। এর পরে তিনি কংগ্রেসে হতাশ হয়ে পড়েন। অন্যদিকে, মৌলবাদী মুসলমান ও খ্রিস্টানরা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে ব্যস্ত ছিল। স্বামীজী আবারও আর্য সমাজের মাধ্যমে বহু লোককে বৈদিক ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। অহিন্দুদের তাদের আসল ধর্মে ফিরিয়ে আনতে শুদ্ধি নামে একটি আন্দোলন শুরু করা হয় এবং বহু লোককে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন একজন কট্টর আর্যসমাজী, কিন্তু সনাতন ধর্মের প্রতি একাগ্র ভাবে নিবেদিত ছিলেন, পণ্ডিত মদনমোহন মালাভিয়া এবং পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী ভারতী কৃষ্ণ তীর্থকে গুরুকুলে নিমন্ত্রিত করা হয়েছিল এবং ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবা ও সম্মতির পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মালকান রাজপুতদের ফিরিয়ে আনলেন হিন্দু ধর্মে। ব্রিটিশ আমল থাকাকালীন শাসনের পক্ষে কোনও বাধা ছিল না।

হত্যা :

১৯২৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর নয়া বাজারে তাঁর বাসভবনে আবদুল রশিদ নামের এক উগ্র মানসিকতার ব্যক্তি তার কক্ষে প্রবেশ করেন এবং এই মহান বিভূতিকে ধর্মের অজুহাতে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। পরে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর হত্যার দু'দিন পরে, অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৬ সালে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে শোক প্রস্তাবে যা বলা হয়েছিল তা অত্যন্ত হতাশজনক ছিল। শোক প্রস্তাবের জন্য গান্ধীর বক্তৃতার একটি উদ্ধৃতি নিম্নরূপ : 'আমি আবদুল রশিদকে ভাই বলেছি এবং আমি এর পুনরাবৃত্তি করেছি। এমনকী তাকে এই জন্য আমি দোষী মনে করি না। দোষীরা আসলে তারা যারা একে অপরের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্ররোচিত করেছিল সুতরাং দুঃখ প্রকাশ করার বা অশ্রু বর্ষণ করার এটি উপলক্ষ্য নয় 'গান্ধী তাঁর বক্তৃতায় আরও বলেছিলেন, '...আমি শ্রদ্ধানন্দজীর মৃত্যুতে শোক করতে পারি না।' একজনের অপরাধের কারণে আমাদের পুরো সম্প্রদায়টিকে অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। আমি আবদুল রশিদের পক্ষে আইনজীবী হতে চাই।'

আজকে শ্রদ্ধানন্দ হত্যার কালিমালিপ্ত দিনে তাঁর দেশ নির্মাণ ও সমাজ গঠনের কাজের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি ও বিস্মৃত এই দেশ সেবকের সামগ্রিক কাজের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। □

এখন থেকে '**প্রণব**' পত্রিকা
অনলাইনেও পাওয়া যাবে—
www.bsspronabpub.com
প্রণব সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করুন—
swamivedanandamaharaj@gmail.com
maharajswaminirmalananda@gmail.com

বঙ্গ-রমণীদের অতি জনপ্রিয় ব্রত 'ইতু'

স্বপন দাশগুপ্ত

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রথাসিদ্ধ ব্রতগুলির মধ্যে অন্যতম ইতুপূজা। এই ব্রত হিন্দু ধর্মীয় ভক্তিবাদে এক লক্ষণীয় সংযোজন। কার্তিক সংক্রান্তিতে আরম্ভ করে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি পর্যন্ত একমাস এই ব্রতানুষ্ঠান পালিত হয়। ইতুপূজা বলতে সূর্যদেবতাকেই বোঝানো হয়। বৈদিক সূর্যবাচক মিত্র শব্দ থেকে মিতু এবং তা থেকে ইথু বা ইতু শব্দের উৎপত্তি। মতান্তরে আদিত্য শব্দের অপভ্রংশরূপে ইতু শব্দের উৎপত্তি। উভয় ক্ষেত্রেই ইতু সূর্যপূজার তাৎপর্য বহন করে। পূর্ববঙ্গে এই ব্রতকে চুঙাই বা চুঙির ব্রত বলা হতো। ব্রতকথায় ইতুকে 'ইতুলক্ষ্মী' বলেও উল্লেখ করা হয়।

বিবাহিত মহিলারা পরিবারের স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও শুভ কামনা করে ঐতিহ্যগতভাবে এই ব্রত পালন করেন। অবিবাহিত মেয়েরা তদের ভবিষ্যৎ পরিবারের মঙ্গলের আশায় এই ব্রত অনুষ্ঠান পালন করেন। বিধবারা সাধারণত এই ব্রতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন না। পুরো অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার সকালে ফলমূল মিষ্টান্ন দিয়ে ইতুর পূজা করা হয়। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে পূজার শেষে নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। ওই দিন নতুন চালের কাঁচা পুলিপিঠে দিয়ে পূজা করে সূর্যাস্তের সময় ইতু ঘট নদী বা পুকুরে ভাসানো হয়। ইতুব্রতীরা ঘরোয়া উঠানে সমবেত হয়ে আচার মেনে মন্ত্রপাঠ, ছড়া-সহ শস্যরোপণের আয়োজন করেন।

এই ব্রত অনুষ্ঠানকারীরা মাটির সরা বা পাত্র লাল ও সাদা রং দিয়ে সজ্জিত করে মাটির উপর ধান, যব, মুগ, মটর ও কলাই এই পঞ্চশস্য ছড়িয়ে দুটি ছোটো ছোটো ঘটে জল ভরে তার উপর ধানের শিষ, দূর্বা, কলমিফুল, তুলসীমঞ্জরী দিয়ে এবং ঘটের গায়ে সিঁদুর ও চন্দনের ফোঁটা-সহ ওই সরার মাটিতে ঘটগুলি স্থাপন করেন। ক্ষেত্রবিশেষে ইতুঘটের সরার শস্যবীজ ও উপকরণের পার্থক্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে মাটির সরার পরিবর্তে গৃহাঙ্গনের নির্দিষ্ট ভূমিতে ইতুর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে সেখানে ইতুর ঘট স্থাপন করা হয়। প্রতি রবিবার প্রত্যেক ব্রত অনুষ্ঠানকারীরা তাদের নির্দিষ্ট ঘটে জল সিঞ্চন করে। শস্য অঙ্কুরোদ্গমনের সময় নতুন গুড়, দুধ ও ময়দা দিয়ে প্রস্তুত খাদ্য, ফলমূল ইত্যাদি নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করা হয়। এই নৈবেদ্য 'ইতুসাধ' হিসেবে পরিগণিত হয়। নৈবেদ্য নিবেদন সমাপ্ত হলে ওই নৈবেদ্য প্রসাদ হিসেবে উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অন্যান্য উৎসবের মতো এই প্রসাদ পুরুষদের মধ্যে বিতরণের প্রথা নেই। ঐতিহ্য অনুসারে সহজ বাংলায় মহিলারা আবৃত্তি করেন 'আমি আটটি বীজ ও আটটি দানা এই পাত্রে রেখেছি। আমি মনোযোগ সহকারে ইতুর গল্প শুনেছি। ইতু আমাদের সুস্থজীবন ও সমৃদ্ধি দান করবে'।

সাধারণ লোকায়ত সমাজে ছড়ার মধ্য দিয়ে নিজেরাই পূজানুষ্ঠান করলেও কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকিয়ে পৌরাণিক রীতিতে সূর্যপূজার সংস্কৃত মন্ত্রাদি পাঠ করার প্রচলন দেখা যায়। এই মন্ত্র মূলত সূর্যদেবতাকে বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করে প্রশংসা করা হয়। সূর্য আমাদের আলোকদাতা, পাপ-হরণকারী। সফল জীবনের উৎস দীপ্তিশীল সৌর বিকিরণ।

পূজার শেষে উমনো ঝুমনোর কাহিনি দিয়ে রচিত ব্রতকথা পাঠ করা হয়। অঞ্চলভেদে এই ব্রত কথার তারতম্য থাকলেও কাহিনিগত ঐক্য যথেষ্ট বিদ্যমান। এই ব্রতকথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরূপ।

একদা এক লোভী ব্রাহ্মণ তার স্ত্রী এবং উমনো ঝুমনো নামে দুই মেয়েকে নিয়ে বাস করত। একদিন ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ খুব ক্রুদ্ধ হলো যখন সে দেখলে প্রস্তুত করা সমস্ত পিঠে তাকে না দিয়ে দুই মেয়েকে একটি করে দেওয়া হয়েছে। রাগে অন্ধ হয়ে লোভী ব্রাহ্মণ দুই মেয়েকে বনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এল। জঙ্গলে সারারাত দুইবোন নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হলো। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয় এবং ভূতের ভয়ে তারা সমস্ত রাত সন্ত্রস্ত হয়ে রইল। ক্ষুধা ও ক্লান্তি সত্ত্বেও শেষ অবধি তারা বনের বাইরে আসতে সমর্থ হলো। ভোরের হিমের মধ্যে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখে স্বর্গের অপ্সরারা তাদের সামনে হাজির হয়ে দুইবোনকে ইতুব্রত করার পরামর্শ দিল। অপ্সরারা বলল এই ব্রত করলে তারা আবার বাড়ি ফিরতে পারবে এবং তাদের আর কোনো অভাব থাকবে না। একজন অপ্সরা তাদের ইতুব্রতের নিয়মাবলী শিখিয়ে দিল। কন্যাদ্বয় সারাজীবন এই ব্রত পালন করে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

এই কাহিনির বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও স্পষ্টতই উমনো ও ঝুমনো সূর্যদেবের স্ত্রী 'ছায়া' আর ঝুমনো অপর স্ত্রী 'সানিনা' যার অর্থ আলো বা 'চেতনা'। ইতুব্রতর পালনকারীরা বলেন অঙ্কুরোদ্গমনের সময় শস্যগুলির আলো ও ছায়া সমানভাবে প্রয়োজন। এই ব্রত থেকে আনুগত্য, বশ্যতা, সাহসিকতা, শপথরক্ষা করা ও বিশ্বস্ততার শিক্ষা পাওয়া যায়।

ইতুমন্ত্র :

অষ্টচাল অষ্টদূর্বা কলস পাত্রে ধুয়ে
শোন সবে ইতুর কথা ভক্তিযুক্ত হয়ে।।
ইতু দেন বর—
ধনধান্যে পুত্র-পৌত্রে ভরে উঠুক ঘর।।

অগ্রহায়ণ মাসে নতুন রবিশস্যের সঙ্গে এই ব্রতের উপকরণ সংযুক্ত এবং এটি মূলত কৃষি সংক্রান্ত ব্রতানুষ্ঠান বলে বিবেচিত হয়।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

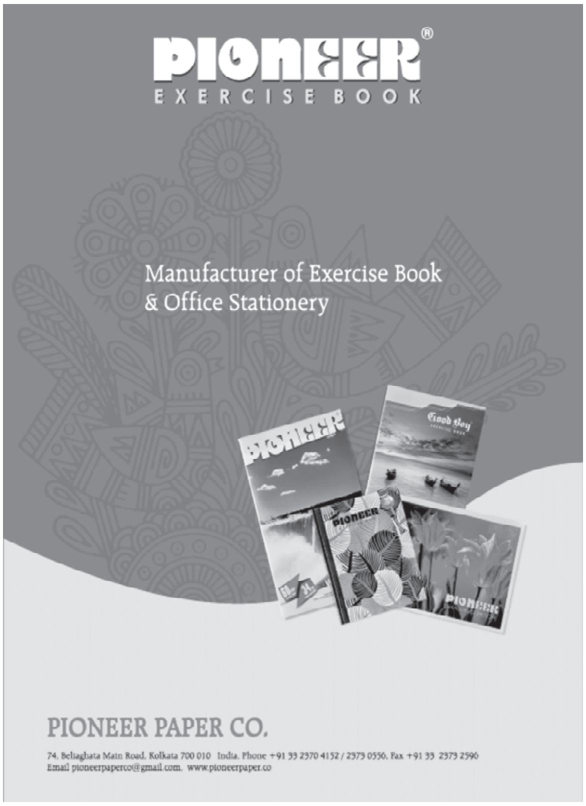

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

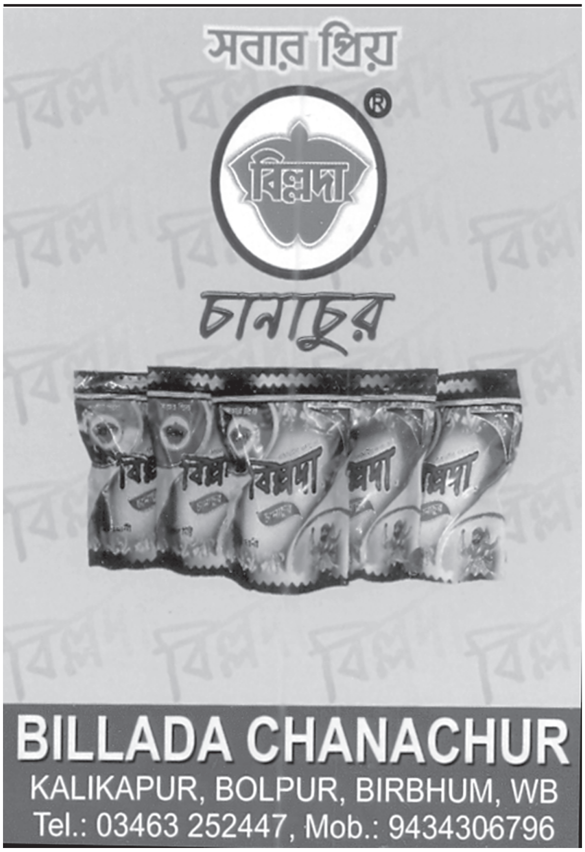

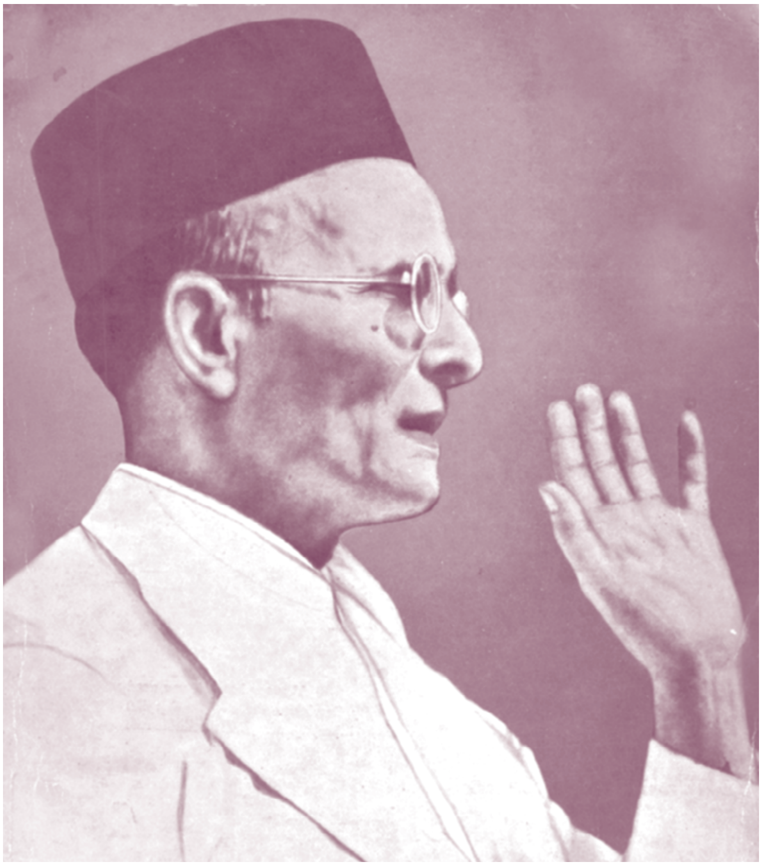

সাভারকরকে বীর উপাধি দিয়েছিলেন স্বয়ং ইন্দিরা

ডাঃ আর এন দাস

কংগ্রেস ও সাভারকরের সম্পর্ক যেন 'সাপে-নেউলে' সম্বন্ধ। ভারতের স্বাধীনতা লাভের বিষয়ে, গত ৭৩ বছর ধরে শেখানো হয়েছে, 'বিনা খড়্গা, বিনা ঢাল, সাবরমতী কে সন্ত নে কিয়া কামাল'। আসল ইতিহাসটিকে জানতে দেওয়া হয়নি। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে যে বীর সেনানীদের আমরণ সংগ্রামের জন্য ইংরেজকে ভারত ছাড়তে হয়েছিল, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই সেটা জানানো হয়নি। মর্মান্তিক এই নাটকের খলনায়ক ছিল কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা।

কংগ্রেস পার্টি সৃষ্টির ইতিহাস দিয়েই শুরু করা যাক। স্কটল্যান্ডনিবাসী আল্যান অকটাভিয়ান হিউম নামে এক ধূর্ত ব্রিটিশ ১৮৪৯ সালে ভারতে আসেন ইম্পিরিয়াল সিভিল সার্ভেন্ট হিসাবে। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-র সময় তিনি উত্তরপ্রদেশের 'ইটাওয়াতে' ইংরেজ সেনার পদস্থ অফিসার ছিলেন। চতুর হিউম বুঝেছিলেন, স্বতঃস্ফূর্ত সেই সংগ্রাম ও জনরোষের অগ্নিশিখা শীঘ্রই দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় 'দ্য আর্ল অব ডাফরিনের' পরামর্শে, ১৮৮৫ সালে বোম্বেতে তিনি 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে'র প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথম সম্মেলনে ইংরেজ ছাড়াও ভারতীয় সমাজের অনেক রাজামহারাজা, প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সদস্যপদ দেওয়া হয় যাতে করে তারা নিপীড়িত জনগণের রোষকে প্রশমিত করতে পারেন! বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন ধর্মান্তরিত প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, জাস্টিস রানাডে, বদরুদ্দিন তায়েবজি, ফিরোজ শাহ মেহতা এবং দাদাভাই নওরোজি। এটা ছিল সম্পন্ন ব্যক্তিদের সান্ধ্যকালীন বৈঠকখানা। সভায় বিতর্কের বিষয় নিপীড়িত জনতার করুণ আকুতির কথা নয় বরং কীভাবে ভারতে ইংরেজ শাসনকে আরও মজবুত করা যায় এবং ১৮৫৭ সালের দাবানলের পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে তারই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা।

সম্প্রতি লোকসভায় সাভারকরকে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' উপাধি দেওয়ার প্রস্তাবে কংগ্রেসের তাবড় নেতাদের বিরোধিতা লক্ষণীয় ছিল। ইতিহাসবিদ ডাঃ বিক্রম সম্পতের লেখা, 'ইকোস ফ্রম দ্য ফরগটেন পাস্ট' নামক গবেষণাগ্রন্থ থেকে জানা যায়, 'ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। কংগ্রেস ব্রিটিশের বিরোধিতা করে স্বাধীনতা চায়নি বরং ইংল্যান্ডেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করে বেঁচে থাকার অধিকার চেয়েছিল। ইংরেজরা জানতো সহযোগী কংগ্রেস থেকে তাদের কোনো বিপদ নেই। বিপদ আসবে বিপ্লবীদের কাছ থেকে। তাই কংগ্রেসকে লাগাতে হবে এই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে'। 'বিভাজন ও কুশাসনের' নীতি তারা অতি চাতুর্যের সঙ্গে ২০০ বছর ধরে ভারতে তথা সারাবিশ্বের উপনিবেশগুলিতে চালিয়ে এসেছিল। সাভারকরের মতো বিপ্লবীরা এই শয়তানি অনেক আগেই বুঝেছিলেন। তাই কংগ্রেসের বিকল্প রাজনৈতিক সংগঠন ও সেনাদল গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। সাভারকরই প্রথম ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মৃত সৈনিকদের শহিদের সম্মান দিয়েছিলেন। লন্ডনে আইন

ফঃ ৫

পড়ার সময়ে ১৯০৬ সালে, ইন্ডিয়া হাউসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে ১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ৫০তম বর্ষ উদযাপন বিষয়ে সাভারকরের ঘোরতর মতান্তর হয়। তাতে গান্ধী তাকে সমর্থনের পরিবর্তে ভীতিপ্রদর্শন করেন। সাভারকর তখন মাদাম ভিকাজী কামা, শ্যামাজীকৃষ্ণ বর্মা, মদনলাল ধিংড়া, লালা হরদয়াল, বীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি-সহ অন্যান্য অনেক বিপ্লবীদের সঙ্গে ১৯০৭ সালে 'তিলক হাউস'-এ সেই উৎসব উদযাপন করেন। তিনি গান্ধীর কড়া সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'ইংরেজরা কংগ্রেসকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে'।

স্বাভাবিক ভাবেই সাভারকর শীঘ্রই ইংরেজ শাসক ও তাঁবেদার কংগ্রেসের কুনজরে পড়েছিলেন। সেকারণেই গান্ধী-নেহেরু আর তাদের সহগামীরা কোনোদিনও সুভাষ বা সাভারকরের মুক্তি বা তাদের পক্ষে সমর্থন জানায়নি বরং তাদের ইংরেজদের হাতে সঁপে দিয়ে পথের কাঁটা দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কংগ্রেসের ৫৮ বছর রাজত্বকালে সুভাষ-সাভারকরদের মতো ক্রান্তিকারীদের সম্মান তো দূরের কথা, ভারতীয় জনমানস থেকে মুছে ফেলার জন্য নিরন্তর প্রয়াস করা হয়েছে। হিউম কংগ্রেসের সৃষ্টি করেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য। পরে সেটা গান্ধীর নিজস্ব পার্টি হয়ে যায়। নেহরু সেটাকে স্বীয় স্বার্থপূর্তির পার্টি করেন। পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন সত্তাধারীরা কংগ্রেসকে কামধেনুর মতো ব্যবহার করতে থাকেন গত ৭৩ বছর ধরে। গান্ধী চেয়েছিলেন স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের বিলুপ্তি হোক কিন্তু আজও বংশবাদের অংশ হিসেবে তাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে কার্তি চিদাম্বরম এম.কে. স্ট্যালিন, রাহুল গান্ধী, অখিলেশ বা লালু যাদবদের স্বার্থরক্ষার জন্য। সাভারকরের ১৯৬৬ সালে দেহাবসানে, ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে বীর ও দেশপ্রেমিক যোদ্ধা হিসেবে সম্মান দেখিয়ে ডাকটিকিট, তথ্যচিত্র এবং স্মৃতিফলকের উদঘাটন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরই বংশধর কংগ্রেস-সভাপতি 'রাহুল ভিঞ্চি' এখন সাভারকর সম্বন্ধে অশ্লীল মন্তব্য করতে সাহস পাচ্ছেন!

গান্ধীর পূর্বে ১৯০৫ সালে সাভারকরই প্রথম পুনাতে বিদেশি বস্ত্র দহন ও বর্জনের আন্দোলন করেন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে, ১৯১০-১৯৩৮, সাভারকরই একমাত্র বিপ্লবী যিনি ১০ বছরের 'কালাপানি'র শাস্তি-সহ ২৭ বছর ব্রিটিশ জেলে নিদারুণ যাতনা সহ্য করেছিলেন।

সেসময় ৬৯৩ জন বন্দির জন্য আন্দামানে তৈরি ছোট্ট সূর্যালোকবিহীন কালকুঠরীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো যাতে 'অর্স্টিওম্যালাসিয়া' নামক হাড়ের রোগে বন্দিরা মারা যায়। কলুর বলদের মতো ঘানিতে জুড়ে দিয়ে প্রতিদিন ১৪.৫ সের সরষের তেল তৈরি করানো হতো। অক্ষম বন্দিদের লোহার বেড়িতে বেঁধে নৃশংসভাবে বেত্রাঘাত, অনাহারে রেখে দৈহিক ও মনোবল কমিয়ে ইংরেজের কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করানো হতো। তাঁকে এমন কুঠরিতে রাখা হয়েছিল যেখান থেকে প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় ক্রান্তিকারীদের ফাঁসি দেওয়া বা প্রকাশ্য দিবালোকে হাত-পা বাঁধা বিপ্লবীদের উপর নিদারুণ নির্যাতনের দৃশ্য দেখানো যায়। ইংরেজরা নিষ্ঠুর পাঠান রক্ষীদের দ্বারাই এসব করাতো। লোহার বেড়িতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শৌচক্রিয়া করানো হতো। সীমিত পরিমাণ সমুদ্রের লবণাক্ত জল দেওয়া হতো। সাভারকর ১০ বছর দেওয়ালকে কাগজ করে পাথর, কাঠকয়লা বা নখকে কলম বানিয়ে ৮-১০ হাজার কবিতার স্তবক লিখেছিলেন। যাতে হাতের কাছে এক টুকরো কাগজ বা কলম না পান তার জন্য জেল-কর্তারা অত্যন্ত যত্নশীল থাকতেন। একই সময়ে লক্ষ্ণৌ বা আলিপুরে জেলবন্দি নেহরু একাধিক ইংরেজি ও হিন্দি পত্রপত্রিকায় দেশবিদেশের খবরাখবর, ব্রিটিশদের শৌর্য ও শঠতার কাহিনি পড়তে পেতেন। নেহরু জলখাবার, দুপুর ও রাতের খাবারের আমিষ ও নিরামিষ মেনু নিজেই ঠিক করতে পারার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। জেলে ধূমপান নিষিদ্ধ হলেও নেশাগ্রস্ত নেহরু জেলারের বিশেষ অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। জেলের মধ্যে তাঁর নিজস্ব পাচকও ছিল মনমতো খাদ্য তৈরির জন্য। সে যুগে ব্রিটিশের জেলবন্দি স্বাধীনতা সংগ্রামীকে কেন এমন বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছিল সেটা বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধী-নেহরুর নেতৃত্বে অহিংসাবাদী বীর আর নিদারুণ যাতনা সহ্য করা, দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের গুরুভার তুলে নেওয়া, নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ, সম্পত্তি ও জীবন বিসর্জন দেওয়া সাভারকর-সুভাষের মতো ক্রান্তিকারীদের সংঘর্ষপূর্ণ জীবন নিয়ে নতুন করে ইতিহাস লেখা হোক।

হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো রোগ হচ্ছে জাতিপ্রথা। গীতায় আছে, 'চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ' কিন্তু কালের প্রবাহে ও বিদেশি শাসকদের কুটিল কুশাসনের ফলে সেটা জন্মগত এবং বর্ণগত হয়ে পড়েছিল। সাভারকর জাতিভেদ প্রথা দূর করার প্রয়াস আমরণ চালিয়ে যান। বিদেশিদের 'বিভাজন ও কুশাসনের' পরিণতি এবং পরিণাম, সহস্র বছরের পরাধীনতার গ্লানির ইতিহাস, তিনি সঠিক ভাবে অনুধাবন করেছিলেন। ভারত সেবা আশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দজী যেমন হিন্দুসমাজের পক্ষে প্রাণঘাতী উইপোকা রূপ জাতপাতের বিষাক্ত কীটাণুকে নির্মূল করার জন্য 'হিন্দুমিলন মন্দিরের' স্থাপনা করেছিলেন, সাভারকরও তেমনি জাতপাতের সীমানা পেরিয়ে সামাজিক সমন্বয় স্থাপনের জন্য হিন্দুমন্দির ও সমরসতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একই সময়ে হিন্দু সংহতি বৃদ্ধির জন্য, লালা লাজপত রায় পুনাতে সর্বজনীন 'গণেশ উৎসবের' প্রবর্তন করেছিলেন। বাঙ্গলায় রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে 'বারোয়ারি দুর্গাপূজার' প্রবর্তন হয়। সমস্ত হিন্দু সমাজকে একই সূত্রে বাঁধার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী সাভারকর। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল 'তাঁতিয়া টোপি ও ঝাঁসির রানির কাহিনি সংবলিত, সাভারকরের লেখা, 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডেন্স ১৮৫৭' বইটিকে 'নিরুৎসাহীদের প্রেরণার স্রোত' বলে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সাভারকরের যে বইগুলি যুবকদের আশা ও অনুপ্রেরণার দীপশিখা প্রজ্বলিত করতে পারতো, ব্রিটিশ শাসকরা এমনকী স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৮ বছর পর্যন্ত মানে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তৎকালীন কংগ্রেসি সরকার ভারতীয় জনমানস থেকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সেগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সম্প্রতি গুজরাট-মহারাষ্ট্র সীমানায় পালঘরে হিন্দুসাধু হত্যা, বিশ্বজনীন 'গায়ত্রী

পরিবারের' প্রধান ডাঃ প্রণব পাণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে মহিলার শ্লীলতাহানির মামলা ইত্যাদি হিন্দুবিরোধী ষড়যন্ত্র—এ কথাই মনে করিয়ে দেয় হিন্দুর জাতীয়তাবোধের জনক সাভারকরের স্মৃতিকে ম্লান করে দেওয়ার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত কেন করা হয়! ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল যাদের সঙ্গে আজ স্বাধীন ভারতে প্রতিদিন তারাই এসব নষ্টামির নায়ক। সেই বীরবিপ্লবীর সংঘর্ষের কাহিনি এবং তাঁর জীবনী সাহিত্যের প্রকাশন প্রয়াত যশস্বী প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী, স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের একক প্রচেষ্টায় কিছুটা হলেও সম্ভব হয়েছিল। সেলুলার জেলের যাতনা সহ্য করতে না পেরে অনেক বিপ্লবী আত্মহত্যা বা অনশনের পথ বেছে নিয়েছিলেন কিন্তু বীর সাভারকর এভাবে জীবননাশের বিপক্ষে ছিলেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জীবিত থেকে এবং জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন। সুভাষের মতো অসমসাহসী সাভারকর ১৯১০ সালের ৮ জুলাই সেলুলার জেল থেকে সাঁতরিয়ে বঙ্গোপসাগর পার হয়ে মারসাইল দ্বীপে পালাতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য পরে আবার ধরা পড়েন। সে সময় জেলবন্দি সাভারকরের উপর যে পরিমাণ অত্যাচার করা হয়েছিল তার সিকি ভাগও অন্য কোনো কংগ্রেসী নেতাকে সহ্য করতে হয়নি। যাঁদের জন্য ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে হয়েছিল, সেই বীরেরা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন কিন্তু নিজেদের আঁখের গোছাতে লাভের গুড়ের ভাগবাটোয়ারায় ব্যস্ত থাকা, সুবিধাবাদী তথাকথিত নেতারা আজ খ্যাতির ছটায় আলোকিত। আজও তাদের নামে ঘটা করে জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। রাস্তাঘাট, পার্ক, এয়ারপোর্ট ও হাজারটা যোজনার নামকরণের মাধ্যমে তাদের দেশদ্রোহিতার স্মৃতিকে জাগরুক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে সাভারকরের প্রতিচ্ছবির তলায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম, সুষমা স্বরাজ, ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াত ও মনোহর যোশী।

অন্যদিকে যারা বীরের মতো ব্রিটিশের অধীনতা অস্বীকার করে জীবনাহুতি দিয়েছিল তাদের জোর করে গত ৭৩ বছর ধরে তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ, সদাসত্যের সন্ধানী সাংবাদিকরা মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার ও সবরকম শঠতার সাহায্যে মিথ্যার মোড়কে সত্যের অপলাপ করে চলেছেন। মোদীর নেতৃত্বে, ২০১৪ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ইতিহাসকে বিকৃত করার অপচেষ্টার প্রতিবাদ করা হচ্ছে। আজ ক্ষমতার নেশায় মত্ত মাতঙ্গের মতো বিচরণশীল চিদাম্বরম, দিগ্বিজয়, লালুপ্রসাদ এবং রাহুলের মতো দেশদ্রোহীদের প্রকৃত বিচারের আশায় দিন গুনছে ভারতবাসী! প্রয়াত ভারতরত্ন অটলজীর কথায়, 'সাভারকর মানে তেজ, ত্যাগ, তপ, তত্ত্ব, তর্ক, তির এবং তলোয়ার। সাভারকর মানে তারুণ্য ও তিলমিলাইট, তিতিক্ষা এবং তিখাপন'।

১৯৪৬ সালের ২২ জুন নেতাজী সুভাষ সাভারকরের বাড়িতে সাক্ষাৎ করেন এবং তিন ঘণ্টার বিস্তৃত আলোচনায় সুভাষের দেশান্তরে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিদেশি ও ভারতীয় সৈন্যশক্তির সাহায্যে ভারত থেকে ব্রিটিশদের উৎখাতের পরিকল্পনা করা হয়। 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র'—এই ছিল সে সময়ের রণনীতি। ১৯৪১ সাল, রাত দেড়টা। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ব্রিটিশ গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে, কাবুল হয়ে জার্মানিতে পৌঁছে যান অসমসাহসী এই বাঙ্গালি বীর। দু' বছরের মধ্যে ৬০ হাজার সেনাকে নিয়ে 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' নেতৃত্ব করেন। হিন্দুনামধারী কাপুরুষ কমিউনিস্ট গুন্ডারা যারা মুসলমানদের ভয়ে সেকুলারপন্থী হয়ে প্রকাশ্যে গোমাংস খায়, যারা স্বাধীনতা সেনানী সুভাষকে 'তেজোর কুকুর' এবং রবীন্দ্রনাথকে 'বুর্জোয়া কবি' বলার সাহস পায়, তারা কি খোঁজ রাখেন সাভারকর লণ্ডনে লেনিনের সঙ্গে স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন? নিজের দেশকে বিদেশিদের কাছে বিক্রি করে দিতে চায়, বিবেকহীন সেসব কংগ্রেসীদের বলতে চাই, এবার তোমাদের বিচারের দিন এসেছে।

'দ্য এপিক সুইপ অব ভি.ডি. সাভারকরের' লেখক ইতিহাসকার হরীন্দ্র শ্রীবাস্তবের কথায়, 'যারা আজ সাভারকর ও সুভাষের মূর্তি ভাঙছে বা কালি মাখাচ্ছে, তারা পশুর সমান'। স্বাধীনতা সংগ্রামী সাভারকর ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, ক্রান্তিকারী, সমাজ-সংস্কারক, দার্শনিক এবং দেশমাতৃকার অসমসাহসী সেনানীদের অন্যতম সন্তান।

ইংরেজি ও মারাঠিতে লেখা, 'হিন্দুত্ব হিন্দু কে', 'কালাপানি', 'মাঝা জন্মথেপ', 'অনাদি মা অনন্ত মা', 'রণসিংহ', 'সংগীত উত্তরক্রিয়', 'মোপলা বিদ্রোহ' প্রভৃতি ৩৮টি পুস্তক সাভারকরের বহুমুখী প্রতিভার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তাঁকে আমরা প্রতিটি বাঙ্গালি ও ভারতবাসী হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে জানাই প্রণতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি!

সঙ্ঘের আদর্শ সেবার পথে আত্মবিসর্জন

ডাঃ আশিস গৌতম

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর এক অভিনব প্রয়োগ। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশববলিরাম হেডগেওয়ার গান্ধীজীর মতোই দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে রাষ্ট্রভক্তদের এক অতি সুন্দর সংগঠন নির্মাণ করেন যা স্বাধীনতার পর সমাজ রচনা ও রাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণে হিন্দুত্বনিষ্ঠ রাষ্ট্রবোধভিত্তিক নতুন নতুন প্রয়োগের উপস্থাপনা করে। আজ সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা দেশের সর্বক্ষেত্রে সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সক্রিয় লোকেদের সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণের যে প্রয়াস করে চলেছে, তার বীজ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পনেরো বছর আগে বপন করা হয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সঙ্ঘের শীর্ষ কার্যকর্তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয় যে, দেশকে পরাধীনতামুক্ত করার জন্য সংগঠন শুরু করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যে তো পূরণ হয়েছে, এখন আগামীদিনে সঙ্ঘের কাজের গতিপ্রকৃতি কীরূপ হওয়া উচিত। এই চর্চার সূত্রপাত করেন পরমপূজনীয় শ্রীগুরুজীর পর যিনি সরসঙ্ঘচালক হয়েছিলেন সেই বালাসাহেব দেওরস ১৯৪৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর নাগপুর থেকে প্রকাশিত একটি কাগজে 'সঙ্ঘকাজের আগামী পদক্ষেপ' নামে এক প্রবন্ধ লিখে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি যে বিচার ব্যক্ত করেন তার মূল কথা হলো— স্বাধীনতার পর এখন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সমাজের লোকেদের সঙ্গে নিয়ে প্রয়োজনানুসারে সমাজ জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সংস্থা তৈরি করে সমাজসেবার মাধ্যমে রাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণের কাজে লেগে পড়বেন।' এর জন্য পরিকল্পনা ও কার্যযোজনা শুরু হওয়ার আগেই গান্ধীজী হত্যার মিথ্যা অভিযোগে সঙ্ঘকে অভিযুক্ত ও লাঞ্ছিত করে তৎকালীন সরকার সঙ্ঘকে লিপিবদ্ধ ঘোষণা করে। সঙ্ঘকে শেষ করার উদ্দেশ্যে নানাভাবে কুৎসিত অপপ্রয়াস করা হয়। সঙ্ঘ তপস্যাবলে সেই অগ্নিপরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আরও তীব্র গতিতে শাখা যোজনার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবাব্রতকে পাথেয় করে সমাজ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কার্যকর্তা নির্মাণে এবং সেই কার্যকর্তাদের দ্বারা বিবিধ সংগঠন সৃষ্টি করে রচনাত্মক, আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বী হিন্দুসংস্কৃতির অনুরারী সেবাকাজ শুরু হয়।

১৯৮৮ সালে জৌনপুরে সঙ্ঘের শিবিরে আমি পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, দেশে যখন সংকট ছেয়ে যায়, সমস্যা গভীর হয়, তখন সেই ক্ষেত্র বিশেষে সঙ্ঘ কোনো সংস্থা বা সেবাকাজ শুরু করে। এটা কি সঙ্ঘের অদূরদর্শিতার পরিচয় নয়? পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজী অত্যন্ত সহজ সরলভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, না, এরকম নয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সঙ্ঘের জানা ছিল যে, সঙ্ঘের শক্তি যেমন যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমন তেমন ক্ষেত্রবিশেষে আমরা হাত দেব, সংগঠন খাড়া করব। এই শক্তিকে সংহত করে স্থান-কাল-পরিস্থিতি অনুসারে সঙ্ঘ সেবা কাজের গতি প্রদান করেছে।

তৃষ্ণার্তকে জলাশয়ের নিকট যেতে হবে— এই সূত্র সঙ্ঘ বদল করেছে— জলাশয়কেই তৃষ্ণার্তের কাছে যেতে হবে। কেউ পদের জন্য কাজ করে, কেউ অর্থের জন্য করে, কেউ প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য করে, কেউ পুরস্কারের লোভে করে। কেউ মতবাদ প্রচারের জন্য করে, কেউ ধর্মান্তরকরণের জন্য করে। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস বলেছেন— যদি অস্পৃশ্যতা পাপ না হয়, তবে পৃথিবীতে পাপ বলে কিছু নেই। এই কথাকে পাথেয় করে পরে সেবাকাজকে সঙ্ঘ তার কার্যপদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার জন্মশতাব্দীর সময় স্বয়ংসেবকরা সমাজের লোকের কাছ থেকে 'নর সেবা নারায়ণ সেবা' নামে সেরানিধি সংগ্রহ করে। সেসময় 'এক শাখা, এক সেবাকাজ' ভাবনায় সেবা ভারতী গঠিত হয়ে কাজ শুরু হয়।

আজ সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সক্রিয় ভূমিকায়, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের সহযোগিতায়, রাষ্ট্রজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, নিজ নিজ ব্যবস্থানুসারে, হিন্দুসংস্কৃতির মূল ভাবে স্থির থেকে নির্ধারিত কাজকে কর্তব্য মনে করে, সত্যিকারের যোগীপুরুষের মতো সমত্বযোগে অধিষ্ঠিত হয়ে সেবারত রয়েছেন। সঙ্ঘের প্রতিটি স্বয়ংসেবক স্বামী বিবেকানন্দের বাণী— 'প্রতিটি নারী, প্রতিটি পুরুষকে ঈশ্বরের রূপেই দেখ। তুমি কাউকে সাহায্য করতে পারো না। তোমার কেবল সেবা করার অধিকার। ঈশ্বরের সন্তান! যদি তুমি ভাগ্যবান হও, তবে স্বয়ং ঈশ্বরের সেবা কর। ঈশ্বরের কৃপায় যদি তাঁর কোনো সন্তানের সেবা করতে পার, তবে তুমি ধন্য হয়ে যাবে। নিজেকে অনেক বড়ো ভাবিও না। তুমি ধন্য। কেননা সেবা করার অধিকার তুমিই পেয়েছ অন্যের নয়।

কেবলমাত্র ঈশ্বরের পূজাভাবে সেবা কর। অনেক দুঃখী প্রাণী আমাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করার জন্য আমাদের সামনে রয়েছে। আমরা যেন রোগী, কুষ্ঠরোগী, পাগল, পাপীরূপে ঘুরে এদিক সেদিক বেড়ানো প্রভুর সেবা করে নিজেদের উদ্ধার করতে পারি।' এই ভাবনায় একাত্ম হয়ে সঙ্ঘ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজের সম্পদে পুষ্ট শত শত সংস্থা, হাজার হাজার স্বয়ংসেবক লক্ষ লক্ষ সমাজবন্ধুকে রাষ্ট্রপুরুষের অঙ্গ মনে করে সেবা করে চলেছে। সেবারত স্বয়ংসেবকরা স্বামীজীর এই বাণী হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছে— 'সাধারণ মানুষ নিজের জীবনের সঙ্গে প্রেম করে। তোমাকে মৃত্যুর সঙ্গে প্রেম করতে হবে।' স্বয়ংসেবকরা জানেন— মৃত্যুর সঙ্গে প্রেম করার অর্থ অপরের কল্যাণ কামনা করে, সেবা করতে করতেই আত্মবিসর্জনের জন্য তৈরি থাকা। ▯

জেতার নেশায় মায়ের কর্তব্য ভোলেননি অঙ্কিতা

নিলয় সামন্ত

মুম্বই ম্যারাথন ও দিল্লির হাফ ম্যারাথনে সাফল্যের পর ২০০৮ সাল থেকে বেঙ্গালুরুতে প্রোক্রেম ইন্টারন্যাশনাল ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন শুরু করে। অ্যাথলেটিক্সের নানান ইভেন্টের মধ্যে একটি মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি হলো ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স গোল্ড লেভেল রোড রেস। আর সেই স্বীকৃতি রয়েছে এই প্রতিযোগিতাটির। টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের পৃষ্ঠপোষকতায় বেঙ্গালুরুর এই টিসিএস ওয়ার্ল্ড ১০-কে বর্তমানে এশিয়ার একমাত্র গোল্ড লেভেল রেস। এই রেসেরই ১৩তম আসরে ঘটে গেল এক অবাক কাণ্ড। কোনও পদক না পেলেও এক মহিলা প্রতিযোগী চলে এলেন সংবাদ শিরোনামে।

অঙ্কিতা গৌড় পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। ২০১৩ সাল থেকে তিনি টিসিএস ওয়ার্ল্ড ১০-কে-তে অংশ নিয়ে আসছেন। বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিক ম্যারাথনেও দৌড়েছেন। এর মধ্যে বার্লিনে দৌড়েছেন ৩ বার। বোস্টন, নিউইয়র্কেও দৌড়েছেন। বর্তমানে তিনি ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এই অবস্থায় তিনি বেঙ্গালুরুতে টিসিএস ওয়ার্ল্ড ১০-য়ে ১০ কিলোমিটার দৌড়লেন মাত্র ৬২ মিনিটে। এবারের দৌড়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'অ্যাপ-সহায়ক এই রেস দারুণ উপভোগ করেছি। এটা খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি ছিল।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রায় প্রতিদিনই এটা করে আসছি বিগত ন' বছর ধরে। ঘুম থেকে উঠেই দৌড়তে চলে যাই। চোট পেলে বা শরীর ঠিক না থাকলেই একমাত্র দৌড়ই না। আমার কাছে এটা শ্বাস নেওয়ার মতো একেবারে সহজাত ব্যাপার। আর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দৌড়ানো ভালো ব্যায়ামও। আমেরিকান কাউন্সিল অব হেলথ জানিয়েও দিয়েছে যে একজন রানারের পক্ষে এটায় কোনও অসুবিধা নেই।'

প্রস্তুতি নিয়ে অঙ্কিতা বলেছেন, 'প্রতিদিনই ৫-৮ কিলোমিটার দৌড়ছিলাম ধীরে ধীরে। ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বলেই ব্রেক নিয়ে দৌড়েছি। কারণ, এখন আমার শরীর আগের চেয়ে আলাদা। অতীতে টিসিএস ১০-য়ে দৌড়ে পদক জিতেছি। কিন্তু এবার তা পারিনি।'

ডাক্তার বা পরিবার, কোথাও বাধা পাননি অঙ্কিতা। তবে গায়নোকোলজিস্ট পরামর্শ দিয়েছিলেন বেশি গতিতে না দৌড়তে। ফিজিওথেরাপিস্টও বলেছিলেন ধীরে ধীরে দৌড়তে। যা তাঁর শরীর ও গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষেও স্বাস্থ্যকর হবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। ডাক্তারের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর পরিবারের তরফেও সমস্যা হয়নি। খেলাধুলা যে সব সময়ই শরীর স্বাস্থ্যের উপযোগী সেটা আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গেল অঙ্কিতার দৌড়ে। আরও একটা জিনিস হলো তাঁর সংযম। বয়সে তরুণী হলেও তিনি অসাধারণ সংযম দেখিয়েছেন। আগে তিনি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে যে পদক জিতেছিলেন সেকথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। কিন্তু এবার তিনি ডাক্তারের পরামর্শ মেনে পদকের জন্য দৌড়ননি।

এবার তিনি দৌড়েছেন একজন দায়িত্বশীল মহিলা হিসেবে। যিনি নিজের শারীরিক সক্ষমতা ও নেশার সঙ্গে সঙ্গে ভাবি সন্তানের সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারটিও মাথায় রেখেছিলেন। এজন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। ■

পুরাণ কথা

নবাঙ্কুর

শিবের অনুগ্রহ

অনেক অনেক কাল আগে মহামুনি গৌতমের শ্বেত নামে এক বন্ধু ছিলেন। গৌতমী গঙ্গার তীরে তাঁর আশ্রম ছিল। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। দিন-রাত তিনি শিবার্চনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন।

কালক্রমে তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে যমদূতেরা শ্বেতের বাড়িতে এল। কিন্তু তারা শ্বেতের বাড়িতে প্রবেশ করতে পারল না। ওদিকে মৃত্যুর সময় পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শ্বেতকে যমালয়ে উপস্থিত হতে না দেখে চিত্রগুপ্ত যমরাজকে বললেন, কী ব্যাপার অনুচরেরা এখনো শ্বেতকে নিয়ে হাজির হলো না! তাকে আনবার জন্য যাদের পাঠানো হয়েছে তারাও ফিরে এল না। এরকম নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া তো ঠিক নয়!

চিত্রগুপ্তের অনুযোগ শুনে যমরাজ তখনই তাঁর প্রধান অনুচর মৃত্যুকে শ্বেতের বাড়িতে যাওয়ার আদেশ দিলেন। নির্দেশ মতো মৃত্যু শ্বেতের বাড়িতে এসে দেখল যমদূতেরা শ্বেতের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। মৃত্যু বিস্মিত হয়ে এর কারণ জানতে চাইলে যমদূতেরা বলল, স্বয়ং মহাদেব শ্বেতকে রক্ষা করছেন, কাজেই আমরা তাঁর কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, তাঁর দীপ্ত তেজের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারছি না। তখন স্বয়ং মৃত্যু শ্বেতের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে পেল শ্বেত বিভোর হয়ে শিবপূজা করছেন। ঘরে যে মৃত্যু হানা দিয়েছে সেদিকে তাঁর খেয়ালই নেই।

এদিকে মৃত্যুকে দেখতে পেয়ে মহাদেবের এক অনুচর বলে উঠল— কী ব্যাপার, তুমি এখানে কেন? শিবভক্তের ওপর তোমাদের তো কোনো অধিকার নেই। মৃত্যু তখন শিবানুচরকে বলল —শ্বেতের কাল পূর্ণ হয়েছে, তাই তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছি। এই বলেই সে শ্বেতের দিকে পাশাস্ত্র নিক্ষেপ করল। মৃত্যুর এই গর্হিত আচরণ ও স্পর্ধায় শিবানুচর ক্রুদ্ধ হয়ে শিবদণ্ড দিয়ে মৃত্যুর মাথায় সজোরে আঘাত করল। সেই ভীষণ আঘাতে মৃত্যু মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মৃত্যুকে লুটিয়ে পড়তে দেখে যমদূতেরা

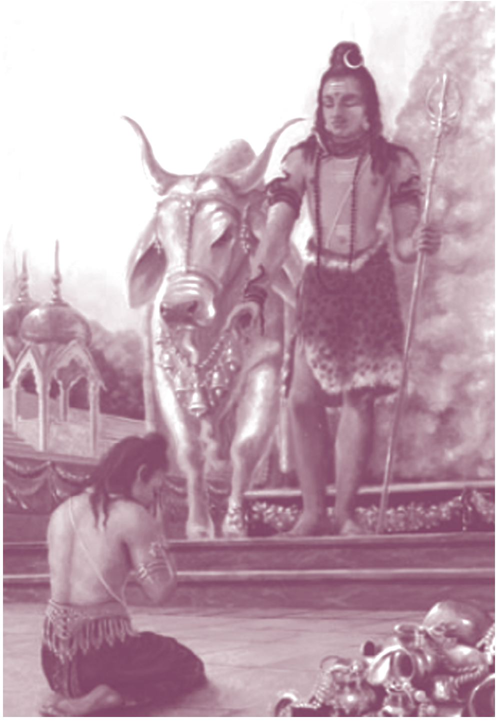

ভীষণ ভয় পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে যমালয়ে ছুটে গিয়ে যমরাজের কাছে ঘটনার কথা নিবেদন করল। শিবানুচরের এহেন স্পর্ধায় যমরাজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে চিত্রগুপ্ত, মহিষ, বেতাল, আধি-ব্যাধি এবং কুক্ষি, অক্ষি ও কর্ণমূল তিন প্রকার জ্বর-সহ সমস্ত নরককে সঙ্গে নিয়ে শিবানুচরকে শাস্তি দেবার জন্য শ্বেতের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। এদিকে যমরাজকে সদলবলে আসতে দেকে সেই শিবানুচর সংবাদ পাঠিয়ে নন্দী-ভৃঙ্গি, কার্তিক, গণেশ সাবইকে হাজির করানো।

শুরু হয়ে গেল ঘোরতর যুদ্ধ। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় যমদূতদের শরীর অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। এক সময় যমরাজকেও তিনি আহত করে ফেললেন। অবস্থা বেগতিক দেখে যমদূতেরা ছুটতে ছুটতে যমরাজের পিতা সূর্যদেবকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করল। তখন সূর্যদেব ব্রহ্মার কাছে গিয়ে সব ঘটনা জানালেন। ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাকে নিয়ে শ্বেতের বাড়ি হাজির হয়ে দেখলেন যমরাজ মর মর অবস্থায় পড়ে আছেন। চারদিকে সংবাদ প্রচার হয়ে যাওয়ায় পৃথিবীর সবাই শেখানে হাজির হলো। দেবতারা তখন শিবের স্তুতি করে বললেন— দেবাদিদেব, ভক্তজনে অনুরাগ ও দুষ্টের দমনের ক্ষমতা সবই তোমাতে বিদ্যমান, আমরা তোমাকে প্রণাম জানাই। আমরা জানি শ্বেত তোমার পরম ভক্ত, কিন্তু তাঁর আয়ুষ্কাল শেষ হয়েছে। তবু দেবতাদের মিলিত শক্তি তাঁকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না, সে ক্ষেত্রে যমরাজের শক্তি তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ— তুমি ছাড়া শ্বেতের ব্যবস্থা বিধানে আর কে সমর্থ হবে?

দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, আপনারা যদি একটি শর্ত মানতে রাজি থাকেন তাহলে আমি অবশ্যই যমরাজকে ছেড়ে দিতে পারি। দেবতারা সমস্বরে সেই শর্ত পালনে সম্মত হলেন। মহাদেব বললেন, আমার শর্ত হলো শিবের ভক্তের কখনই মৃত্যু হবে না। দেবতারা বললেন— প্রভু, তাহলে তো সৃষ্টির নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। মহাদেব বললেন, তাহলে শোনো, যারা সৎভাবে জীবনযাপন করে নিত্য গঙ্গস্নান করে আমার পূজা করবে তাদের মৃত্যু স্পর্শ করলেও নরক ভোগ করেতে হবে না। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে দেবতারা মহাদেবের শর্তে রাজি হলেন। তখন মহাদেব সবাইকে সুস্থ করে দিলেন। সেই থেকে পরম শিবভক্তকে নরক ভোগ করতে হয় না।

শ্যামাপদ সরকার

ভারতের পথে পথে

বৈজনাথ

কাংড়া উপত্যকার শেষপ্রান্তে ১৩৬০ মিটার উচ্চতায় ছোট্টো শহর বৈজনাথ। একটু দূরে ধৌলাধার, সামনে আকাশপুরী রেঞ্জ। নীচে বয়ে চলেছে বিনোয়া নদী। জনশ্রুতি, এখানেও রয়েছে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বৈদ্যনাথ শিব। অতীতের কিরানরামা বর্তমানে বৈজনাথ। বৈদ্যনাথ মন্দির চত্বরে আরও ১৬টি মন্দির রয়েছে। মন্দির ওড়িশার আদলে আমলক শিরে নাগারি শৈলীর। কারুকার্যমণ্ডিত মন্দিরের বিগ্রহও অতি সুন্দর। প্রবেশপথের কুলুঙ্গিতে রয়েছে গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, সূর্য, চামুণ্ডা, কার্তিকেয়, নন্দী ছাড়াও নানান দেব-দেবার মূর্তি। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, মন্দিরটি পাণ্ডবভ্রাতারা তৈরি করেন। শিবরাত্রিতে এখানে জাঁকালো উৎসব হয়।

জানো কি?

বিভিন্ন দেশের জাতীয় খেলা

- ভারত ও পাকিস্তান— হকি।
- বাংলাদেশ— কাবাডি • ভুটান —ধনুর্বিদ্যা বা তিরন্দাজি।
- শ্রীলঙ্কা ও নেপাল — ভলিবল।
- ইন্দোনেশিয়া ও মালেশিয়া — ব্যাডমিন্টন।
- চীন — টেবিল টেনিস।
- আমেরিকা — বেসবল। • কানাডা — আইস হকি। • স্পেন, ইতালি পোল্যান্ড — ষাঁড়ের লড়াই।
- ব্রাজিল ও ফ্রান্স — ফুটবল।
- ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া — ক্রিকেট। নিউজিল্যান্ড— রাগবি ইউনিয়ন।

ভালো কথা

পরিবেশ বাঁচতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পরিবেশ নিয়ে সকলেই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন এটটা বোঝা যায়। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগে সবাইকে এগিয়ে আসতে খুবই কম দেখা যায়। কলকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলি এবার বাস্তব প্রয়োগে আক্ষরিক অর্থেই এগিয়ে এসেছে। তাদের সবকটির প্রবেশ দ্বারের সামনে ঝুলছে প্ল্যাকার্ডে 'নো প্লাস্টিক ব্যাগ'। গত সরস্বতী পুজোয় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থার্মোকল কিংবা প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার হয়নি। এছাড়াও তারা পরিবেশ বাঁচাতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জিডি বিড়লা ইনস্টিটিউট তাদের দেওয়ালে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি নিয়েছে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ক্যাম্পাসে পুরোপুরি প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে। হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ১০০ কিলো ওয়াটের সৌর প্যানেল বসিয়েছে।। একটু অন্য রকমের উদ্যোগ নিয়েছে সাখওয়াত মেমোরিয়াল হাই স্কুল। গত শিক্ষক দিবসে ছাত্রীরা প্রত্যেক শিক্ষিকাকে গাছের বীজ উপহার দিয়েছে। কলকাতার পরিবেশ সচেতন মানুষেরা ছাত্র-ছাত্রীদের এই উদ্যোগের খুবই প্রশংসা করছেন।

সুদেষ্ণা ধর, একাদশ শ্রেণী, রাসবিহারী এভিনিউ, কল-১৯।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ত রা ল কা

(২) ধি ক না য়

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ন ন্ত কা ব লী স

(২) ন ভু ন মো ব হ

৯ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) অধিবেশন (২) পাগলপারা

৯ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) প্রকৃতিবিরুদ্ধ (২) বিক্ষোভমিছিল

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। (২) অর্ঘকমল সাঁই, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (৪) শ্রেয়ান হালদার, বৈষ্ণবনগর, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২৮।।

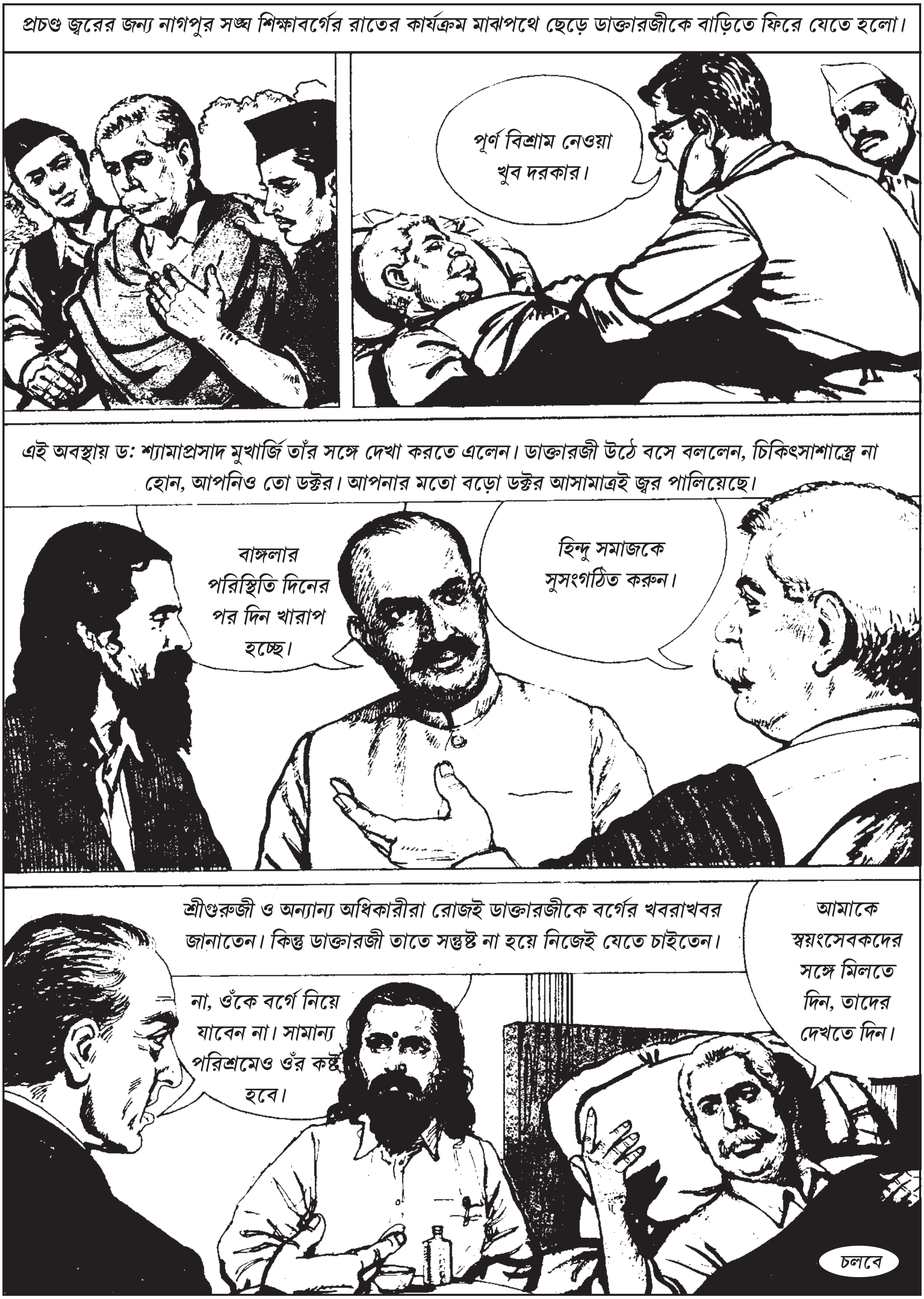

একে একে নিভিছে দেউটি

রামানুজ গোস্বামী

ডিসেম্বর মাসটি সত্যিই ঐতিহাসিক বার্তা বহন করে নিয়ে এল এই পশ্চিমবঙ্গে। এ যেন এক নতুন যুগের সূচনা। এক নতুন ভোরের পবিত্র সূত্রপাত। কোনও রকম ভূমিকা না করেই বলতে হয় যে, গত ১৯ ডিসেম্বর মেদিনীপুরে যে ঐতিহাসিক সভা করা হয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) তরফে, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় এটাই যে, পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তে এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এক দশক আগে ২০১১ সালে এই রাজ্যে একবার পরিবর্তন হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপরে কেটে গিয়েছে অনেকটা সময়। ২০১৪ সালে ভারতের ক্ষমতায় আসে মোদী-সরকার। এরপরে গত বছর ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় বারের জন্য আরও বেশি সংখ্যক আসনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে। উল্লেখ্য যে, এই রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৮টি-তে জয়লাভ করেছে বিজেপি। যে তৃণমূল ৪২টি আসনেই জয়লাভের জন্য একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাদের ২২টি আসন পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ যে ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়েছে, তার স্পষ্ট প্রমাণ এই লোকসভা নির্বাচনেই পাওয়া গিয়েছিল।

মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে, এই রাজ্যে আবারও একবার পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দুর্নীতি, বেকারত্ব, নারী-নির্যাতন, শিল্পায়নের অভাব, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকাঠামোর ঘাটতি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, ক্রমবর্ধমান অপসংস্কৃতি ইত্যাদি কারণেই বাঙ্গালি এক বিকল্পের সন্ধান করছিল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যের বাঙ্গালিরা সেই নতুন বিকল্পেরই সন্ধান পেল। এরপরে কেটে গিয়েছে আরও প্রায় দেড় বছর। সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতও যুদ্ধ করে চলেছে অতিমারীর সঙ্গে। ভারতের মতো এত জনবহুল ও

ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এই অতিমারীর ভয়াবহ প্রভাব দুর্দান্ত ভাবে রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুদক্ষ পরিকল্পনা ও সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলেই। সারা পৃথিবী তাই আজ ভারতের এই সর্বোত্তম ফলের জন্য মোদীজীর প্রশংসায় জয়ধ্বনি করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সঙ্কটকালেও সংকীর্ণ রাজনীতির পরিচয় দিয়েছে। এককথায় এটা বোঝাই যায় যে, এই রাজ্যের মানুষ এতদিন যে ক্ষোভ মনের মধ্যে রেখে দিয়েছিল, অতিমারী, আমফান ইত্যাদি নানা কাণ্ডের কারণে তা দাবানলের মতো জ্বলে ওঠে। বিজেপি এতদিন বা এত বছর ধরে যে সব নীতি বা আদর্শকে সম্বল

করে লড়াই করে আসছিল, তাতে দলে দলে সাধারণ মানুষ শামিল হতে শুরু করে। এই চিত্রটির সঙ্গে আমরা সকলেই এতদিন পরিচিত ছিলাম। কিন্তু তৃণমূল যে এভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে থাকবে এবং প্রতিদিনই যে দলে দলে সাধারণ কর্মী থেকে নেতা-নেত্রী, বিধায়ক, সাংসদরা দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এবং দলে দলে তৃণমূল ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, তাতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও বিস্মিত। উল্লেখ্য যে, ২০১১ সালের আগে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট যখন টালমাটাল হয়ে পড়েছিল, তখনও এই ভাবে দলে দলে দলত্যাগ বা ইস্তফা দেওয়ার ঢেউ ওঠেনি। কিন্তু এখন সেটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই প্রশ্ন এটাই যে, কেন তৃণমূল কংগ্রেসের এই পরিণতি হলো? এবারে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

প্রথমেই একটা কথা বলা দরকার যে, বিজেপি একটি আদর্শনিষ্ঠ দল। এই দলের কিছু নিয়ম-নীতি ও আদর্শ আছে যা একেবারেই সুনির্দিষ্ট। বিজেপি চিরদিনই এই সকল আদর্শের ভিত্তিতেই ভোটে লড়ে এসেছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র বলে তেমন কিছুই নেই, কারণ ওটি এক বা দুই ব্যক্তি বা পরিবারকেন্দ্রিক দল। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই যে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগে কংগ্রেস চিরদিনই অভিযুক্ত হয়ে এসেছে, এই রাজ্যে বর্তমানে তৃণমূল

ফঃ ৬

কংগ্রেসও সেই একই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে চলেছে। বিজেপির ক্ষেত্রে এটা বলাই যায় যে, তাদের রাজনীতি হলো জাতীয়তাবাদী রাজনীতি। শ্যামাপ্রসাদ-দীনদয়াল হলেন বিজেপির আদর্শ। সব মিলিয়ে বোঝাই যায় যে, বিজেপি দাঁড়িয়ে আছে প্রচণ্ড শক্তিশালী গঠনতন্ত্র এবং নিজস্ব আদর্শের ভিত্তির উপরেই। কিন্তু রাজ্যের শাসকদলের সেরকম কোনও গঠনতন্ত্র নেই— কারণ এটি একেবারেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল। হয়তো সেই কারণেই এই দলের সঙ্গে আর থাকতে চাইছেন না বহু নেতা-মন্ত্রীই। এমনকী নন্দীগ্রাম গণ-আন্দোলনের পুরোধা শুভেন্দু অধিকারীও আত্মসম্মান, ন্যায়-নীতি ও আদর্শের কারণে যোগ দিলেন বিজেপিতে। গত ১৯ ডিসেম্বর মেদিনীপুরে কলেজ-মাঠে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঐতিহাসিক জনসভায় শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগদান করেন। একইসঙ্গে আরও বহু বিধায়ক বিজেপিতে শামিল হলেন। প্রশ্ন হলো যে, কেন এমনটা ঘটল?

একথা তো কখনই অস্বীকার করা যাবে না যে, শুভেন্দু অধিকারী একজন জননেতা। অনেক লড়াই করে তিনি উঠে এসেছেন। শুধুমাত্র দুই মেদিনীপুরেই নয়, রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলাতেও তাঁর যথেষ্ট জনভিত্তি রয়েছে। তাই তাঁর মতো নেতার এত বছরের পুরনো দল ছেড়ে বিজেপিতে চলে যাওয়া, নিঃসন্দেহে তৃণমূলের কাছে একটা বড়ো ধাক্কা। শুধু শুভেন্দু অধিকারীই নন, আরও বহু নেতা এখন তৃণমূল প্রসঙ্গে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। বস্তুত, এটা বোঝাই যায় যে, তৃণমূল ছেড়ে দলে দলে সর্বস্তরের নেতারা বিজেপির দিকে চলে আসতে চাইছেন। প্রশ্ন হলো যে, এখনও যখন এই রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, তাহলে ক্ষমতাসীন দলকে ছেড়ে বিরোধী দলে যোগদানের পিছনে কী কারণ থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই এই নেতারা কেউ মন্ত্রী, কেউ-বা বিধায়ক আবার কেউ-বা সাংসদ অথবা অন্য কোনও পদ অলংকৃত করে আছেন। তবু এরা ক্ষমতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। প্রশ্ন হলো কেন?

যতদিন যাচ্ছে, তৃণমূলের মধ্যেই অন্তর্কলহ প্রকট হচ্ছে। মানুষের জন্য যারা কাজ করতে চান, তৃণমূলের সেইসব নেতা-নেত্রীরা বিজেপিতে যোগদান করেছেন ও আগামীদিনেও করবেন। মোদীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজেপির জয়ধ্বজা পশ্চিমবঙ্গেও উড্ডীয়মান হবে খুব শীঘ্রই।

এক্ষেত্রে উত্তর এটাই যে, এরা আর নীতি ও আদর্শের সঙ্গে আপোশ করতে চান না। তাছাড়া এরা নিজেদের হারানো আত্মসম্মানও ফিরে পেতে চান। তাই সকলেই কমবেশি তৃণমূল প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। বিজেপি যে আদর্শ, যে নীতি নিয়ে এত বছর ধরে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করে চলেছে, সেই কর্মযজ্ঞে আজ তৃণমূল, বামফ্রন্ট, কংগ্রেস— সব দল থেকেই নেতা ও কর্মীরা যোগ দিচ্ছেন ও ভবিষ্যতে আরও যোগ দেবেন। এইসব দলগুলির মানুষের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগই নেই। তাই, 'দুয়ারে সরকার'-এর মতো সরকারি প্রকল্প সত্ত্বেও তৃণমূল যে টালমাটাল, তার আরও একটি প্রমাণ বোলপুরে অমিত শাহের রোড-শোতে বিপুল জনসমাগম।

বস্তুত বীরভূম জেলায় শাসকদলের সন্ত্রাস ও আগ্রাসী মনোভাবের সঙ্গে রাজ্যবাসী দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত। তবুও শাসকদলের নেতাদের ও দুষ্কৃতীদের ভয় উপেক্ষা করেও বহু মানুষ সেদিন (২০ ডিসেম্বর) বোলপুরে অমিত শাহের রোড-শোতে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি যে এই রাজ্যে আবারও একটি পরিবর্তন ঘটাতে চলেছে, সেকথা এখন হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে সর্বত্রই আলোচিত হচ্ছে।

যতদিন যাচ্ছে, তৃণমূলের মধ্যেই অন্তর্কলহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই প্রকৃত অর্থে মানুষের জন্য কাজ করতে চান যারা, তৃণমূলের সেইসব নেতা-নেত্রীরা বিজেপিতে যোগদান করেছেন ও আগামীদিনেও করবেন। মোদীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজেপির জয়ধ্বজা পশ্চিমবঙ্গেও উড্ডীয়মান হবে খুব শীঘ্রই, পশ্চিমবঙ্গের জনগণের এটাই কাম্য। □

With Best Compliments from -

A
Well
Wisher

আলেম-ওলামাদের ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নতুন বছরে পা দিল

বাংলাদেশে আলেম- ওলামাদের দাপট ক্রমেই বাড়ছে। তারা জানে, তাদের মাথার ওপর রয়েছে রাজনীতির ছায়া। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ভিত্তি দুর্বল হলেও ক্ষমতাই আসল। আর এই ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে পারেন আলেম-ওলামারা, জনগণ নয়। এই বিশ্বাস রাজনীতির ছায়াকে ক্রমেই বড়ো করছে।

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ করেনার মধ্যেও পুরনো বছরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর ব্যাপক হামলা নির্যাতন ও তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি, ভাস্কর্য বিরোধিতার নামে হিন্দুদের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে মুসলমানদের উস্কে দেওয়া, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় আলেম- ওলামাদের ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নতুন বছরে পা দিয়েছে। ২০২০ সালে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা নতুন মাত্রা লাভ করে।

সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও সামাজিক- সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতারা বলেছেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জানমাল রক্ষায় জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু নিরাপত্তা আইন, সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রণালয় গঠনের দাবি থাকলেও সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। যদিও শাসক আওয়ামি লিগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে এসবের অঙ্গীকার ছিল।

বছরজুড়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নের চিত্র উঠে এসেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচের গবেষণায়।

চলতি বছরের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর— এই সাত মাসের ‘সাম্প্রদায়িক চালচিত্র’ শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সময়ে দেশে হিন্দু

ধলাই জেলায় প্রত্যন্ত পাহাড়ী গ্রামীণ উন্নয়ন ব্লক ছাওমনুর উন্নয়নের সফলতার চিত্র।

PMAY (G) 2019-2021 Year

PERFORMANCE ON PMAY(G) UNDER CHAWMANU R.D BLOCK

Financial Year	Target of house construction	Completed
2019-20	1109	859

PERFORMANCE ON TOILET CONSTRUCTION (LOBTIOLET) UNDER CHAWMANU R.D BLOCK

Financial Year	Target of house construction	Completed
2019-20	1946	1946

PERFORMANCE ON MANDAYS GENERATION UNDER CHAWMANU R.D BLOCK

Financial Year	Total job Card	Average Mandays Created
2020-21	10431	91 mandays

PERFORMANCE ON HOUSE CONSTRUCTION UNDER MSDP SCHEME UNDER CHAWMANU R.D BLOCK

Financial Year	Total job Card	Average Mandays Created
2019-20	245	245

Advt.

সমাজের ১৭ জনকে হত্যা, ১০ জনকে হত্যার চেষ্টা, ১১ জনকে হত্যার হুমকি, ৩০ জনকে ধর্ষণ ও নির্যাতন, ছয় জনকে ধর্ষণের চেষ্টা, শ্লীলতাহানির কারণে তিনজনের আত্মহত্যা এবং ২৩ জনের অপহরণের শিকার হওয়ার তথ্য এসেছে সংবাদ মাধ্যমে। পাশাপাশি ২৭টি প্রতিমা ভাঙচুর, ২৩টি মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ২৬টি বসতবাড়ি জমি ও শ্মশান উচ্ছেদের ঘটনা, পাঁচটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দখলের ঘটনা, ৭৩টি উচ্ছেদ চেষ্টা, ৩৪ জনকে দেশত্যাগের হুমকি, ৬০টি পরিবারকে গ্রামছাড়া করা, চারজনকে ধর্মান্তরিত হতে হুমকি, সাতজনকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা, ৮৮টি বাড়ি-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর ও লুটপাট, ২৪৭ জনের ওপর দৈহিকভাবে হামলা এবং ধর্ম নিয়ে 'কটুক্তি' করার অভিযোগে চারজনকে আটক করা হয়েছে। ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হামলা আরও ব্যাপকতা পায়, কিন্তু পরিপূর্ণ চিত্র এখনও পাওয়া যায়নি।

ফরাসি সাময়িকীতে নবীকে (সা.) নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলমান দেশে ক্ষোভ চলছিল, যার আঁচ লাগে বাংলাদেশেও। এর মধ্যেই ৩০ অক্টোবর সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ভয়ংকর ঘটনা পুরো বাংলাদেশকে স্তম্ভিত করে দেয়।

সাম্প্রদায়িক হামলার মধ্যে ভয়াবহ কয়েকটি ঘটনা হচ্ছে, ১ নভেম্বর কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় ধর্ম অবমাননার ধুয়ো তুলে মাইকে প্রচার চালিয়ে লোকজনকে জড়ো করে মুরাদনগরের কোরবানপুর গ্রামে হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে হামলা-অগ্নিসংযোগ হয়। পূর্ব ধউর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বনকুমার শিব ও তার ভাইয়ের বাড়িও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দেড় ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এলেও হামলাকারীদের বাধায় ঢুকতে পারেনি। পুলিশ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বাসিন্দা ও ভুক্তভোগী সবারই অভিযোগ, পরিকল্পনা করেই এ ঘটনা ঘটানো হয়।

এর আগে গত ১৬ মে ভোলার মনপুরার চৌমুহনি বাজারে এক হিন্দু মাছ ব্যবসায়ী তরুণের ফেসবুক আইডি থেকে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ উঠলে জুম্মার নামাজের পর কিছু লোক মিছিল করে ওই যুবকের দোকানে হামলা চালায়। পুলিশ বাধা দিলে সংঘর্ষ বাধে, তাতে অন্তত ১০ জন আহত হন। পরে ওই যুবকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করে পুলিশ।

হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, হত্যা, মন্দির ভাঙচুর, এমনকী হিন্দু মেয়েদের নির্যাতন বাংলাদেশের নিত্য ঘটনায় পরিণত। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানকার পুলিশ থাকছে নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

গত ২১ এপ্রিল কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার কালিগঞ্জ ইউনিয়নের সাতানি হাইল্লা গ্রামে 'ইসলাম ধর্ম অবমাননার' অভিযোগে এক হিন্দু যুবকের ওপর হামলা করা হয়। পরে পুলিশ সেই যুবককে গ্রেপ্তার করে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের আগে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা এ বছরও ঘটেছে দেশের কয়েকটি জেলায়। ফরিদপুরের টিটুরকান্দি, চট্টগ্রামের সাতকনিয়া, জামালপুরের মেলান্দহ, লক্ষ্মীপুরের শাঁখারিপাড়া, কক্সবাজারের চকরিয়া, সিলেটের যতরপুর, চট্টগ্রামের লোহাগাড়া, রাঙামাটির কেপিএম, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, বাগেরহাটের চিতলমারী এবং মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘর ও উপাসনালয়ে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা উঠে এসেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদনে।

এ বছরও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের সাক্ষী হয়েছে ভোলার মনপুরা, কুমিল্লার কোরবানপুর গ্রাম। একই অভিযোগে মানুষ পুড়িয়ে মারার মতো নৃশংসতা ঘটেছে লালমণিরহাটের বুড়িমারীতে।

২০২০ সালে সারা দেশে নারী ও শিশু ধর্ষণ-নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে ব্যাপকভাবে। অতিমারীর বছরেও দেশে নারী ও শিশু সহিংসতা থেকে রেহাই পায়নি। আগের বছরের মতো অব্যাহত ছিল সহিংসতা। সহিংসতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ধর্ষণ ও পারিবারিক সংহিংসতা। খোদ পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে, এ বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে ২০ হাজার ৭১৩ জন নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৬ হাজার ৯০০ জন নারী। গত বছরের তুলনায় যা অনেক বেশি। গত বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১২ মাসে ধর্ষণের শিকার হন ৬ হাজার ৭০০ জন। নির্যাতনের শিকার হয় ২১ হাজার ৭৬৯ জন নারী ও শিশু।

নির্যাতিতদের মধ্যে সংখ্যালঘু সমাজের নারী ও শিশুরাও আছে। প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সাভারের নীলা রায় হত্যাকাণ্ড ছিল এ বছরের অন্যতম আলোচিত ঘটনা। সেই ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুবিচার মেলে না বলে অভিযোগ রয়েছে

ধলাই জেলায় সমগ্র শিক্ষার সফলতার একনজরে খতিয়ান চিত্র।

ASPIRATIONAL DISTRICT SCHEME LAUNCHED IN JANUARY, 2018

As a part of Aspirational District the **NCERT, New Delhi** has adopted Ambassa Block and conducted a workshop jointly with District Project Coordinator, Samagra Shiksha Abhiyan on Baseline Survey on 11.12.2018 for all the HMs/ TICVs of JB, SB, High and HS Schools of Ambassa Block at PWD Conference Hall, Ambassa to assess the learning level of the learners in Ambassa Block.

Intervention-wise action taken and achievement report on Aspirational District Plan, Dhalai up to 31st December, 2020 as follows:-

SL.	INTERVENTIONS	TARGET	ACHIEVEMENT UP TO 30.9.2019
1.	Electricity	24 (22 nos. High School & 2 nos Higher Secondary)	100%
2.	Girls Toilets	85 nos Girls Toilets	34%
3.	Drinking Water	152 nos. Drinking Water Source	32%
4.	Distribution of Girls Bi-cycle, 2019-20	2833	100%
5.	Distribution of Jt. Bench	1315 nos.	100%

PRESENT STATUS OF LEARNING OUTCOME (NATUN DISHA)

Name of District	Class	Total	Language				Mathematics			
			Class Appropriate		Prerana & Sadhana		Class Appropriate		Prerana & Sadhana	
			Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Dhalai	III	6694	4729	70.65	1965	29.35	4656	69.55	2038	30.45
	IV	7377	5469	74.14	1831	24.82	5209	70.61	2091	28.34
	V	6969	5581	80.08	1388	19.92	5150	73.90	1819	26.10
	VI	6517	5260	80.71	1257	19.29	4947	75.91	1570	24.09
	VII	6102	5216	85.48	886	14.52	4884	80.04	1218	19.96
	VIII	6298	5590	88.76	708	11.24	5275	83.76	1023	16.24

CONSOLIDATED PROGRESS REPORT UNDER SAMAGRA, DHALAI DISTRICT

SL.	INTERVENTIONS	TARGET (Physical)	ACHIEVEMENT (Up to 31st December, 2020)
1	Free Text Books	60481	60481
2	Uniform	59085	59085
3	Teacher Training (in service)	6596	6596
4	Inclusive Education	409	409
5	Status of Teachers	1485	1352
6	Status of Students	70506	
7	School Management Committee/PRI Training	4956	996
8	Special Training for Out of School Children	109	109
INFRASTRUCTURE			
9	Total School	826 (Govt.)	
10	Block Resource Centre	8	
11	Cluster Resource Centre	50	
12	Primary Schools	495	
13	Upper Primary Schools	239	
14	High Schools	62	
15	Higher Secondary Schools	32	
16	Residential Hostel	4	
17	KGBV(Type-1 & Type- 4)	6	
18	Girls' Hostel	3	
19	Residential Special Training Centre	6	

OFFICE OF THE DISTRICT PROJECT COORDINATOR
(DISTRICT EDUCATION OFFICE)
SAMAGRA SHIKSHA ABHIYAN
DHALAI DISTRICT
****

Advt.

ঐক্য পরিষদের। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, সেপ্টেম্বরে সিলেটের জালালবাদে এক হিন্দু পরিবারের ১২ বছরের মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়। তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও পুলিশের 'সহযোগিতা না পেয়ে' পরিবারটি 'ঐক্য পরিষদে'র দ্বারস্থ হয়। এরপর বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হলেও একসময় বিষয়টি চাপা পড়ে যায়।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ অভিযোগ করেছে, গাইবান্ধার হিজলগাড়ি, রাজশাহীর ঘাসিগ্রাম, বরিশালের উজিরপুর, ফরিদপুরের বাসপুর, রংপুরের দোওয়ানটুলি, ময়মনসিংহের হাতিলেইট গ্রামের এরকম আরও কয়েকটি যৌন নিপীড়নের ঘটনায় সুবিচার মেলেনি। দেশের নানা স্থানে অপহরণের পর ধর্মান্তরিত করার ঘটনাও ঘটেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচ। এরকম বেশ কিছু ঘটনা তাদের প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা বলেছেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় মামলার হার ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। নির্যাতনের ঘটনায় মামলা দায়েরের হার ক্রমশ কমছে। এসব মামলায় বিচার পাওয়ার হার ৫ থেকে ৬ শতাংশ। নির্যাতনের ঘটনায় বিচার আমলে না নেওয়া, বিচারের দীর্ঘসূত্রতা ও যথাযথ বিচার না পাওয়ায় অনেকেই মামলা করেন না। দেশত্যাগকেই তারা সমাধান মনে করেন।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের চাপে পড়ে আওয়ামি লিগ সরকার গত নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের কথা তাদের ইস্তেহারে লিখেছিল। সেটা কিন্তু আমরা দুই বছরের মধ্যে কার্যকর হতে দেখিনি। এছাড়া সাক্ষী নিরাপত্তা আইন করার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, এই ধরনের নির্যাতনের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগও মামলা করে না। কারণ মামলা করলে তো আরেক ধরনের নির্যাতন। আসামীরা হুমকি দেবে, দেশছাড়া করবে। আইনের বিরাট পরিবর্তন দরকার। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলকাগুলোতে পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে হবে, সেই সঙ্গে তারা যেন গুরুত্ব দিয়ে বিষয়গুলো বিবেচনা করে সেটাও দেখতে হবে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের গ্রেপ্তারের সমালোচনা করে নেতৃবৃন্দ বলেন, ধর্মীয় অবমাননা আইনটি যদি সব ধর্মের জন্য হয়, চারটি ধর্মের যে কোনো জায়গায় যে কোনো আঁচড় লাগলে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে একইভাবে প্রতিক্রিয়া আসতে হবে।

সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও উগ্রবাদের বিস্তার থামানো যায়নি। বছরের শেষভাগে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণকে কেন্দ্র করে সকল মূর্তির বিরুদ্ধে হুঙ্কার তুলেছে উগ্রবাদী গোষ্ঠী। ফলে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি করেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। মন্দিরে হামলা ও মূর্তি ভাঙচুর বাংলাদেশে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই হুঙ্কারে মন্দিরে হামলার ঘটনা আরও বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর মধ্যে তার আলামত পাওয়া যাচ্ছে।

আওয়ামি লিগ এক হাতে উগ্রবাদী জামায়াতে ইসলামকে দমন করছে, অন্য হাতে উগ্রবাদী, নারী নেতৃত্ব ও নারীশিক্ষা বিরোধী হেফাজতে ইসলামকে কাছে টেনে নিয়ে শক্তি পরিপুষ্ট করছে। তাদের দাবি মেনে শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামিকরণ করা হয়েছে, কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিকে সাধারণ শিক্ষার সমমানে দাঁড় করিয়েছে। যা আত্মঘাতী বলে ইতিমধ্যে শিক্ষাবিদরা উল্লেখ করেছেন। আর এই হেফাজতই এখন জাতির জনকের ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে জিহাদে নেমেছে। বিভিন্ন জেলা থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে, জামায়াতে ইসলামি ও হেফাজত-সহ বিভিন্ন ইসলামি দলের নেতারা আওয়ামি লিগের তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনে যোগ দিচ্ছেন, আওয়ামি লিগ নেতারাও তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করছেন। মাত্র কয়েকদিন আগে চট্টগ্রামে আওয়ামি লিগের এক উপজেলা কমিটিতে সভাপতি হিসেবে যাকে মনোনীত করা হয়েছে তিনি বছরখানেক আগে এক মন্দিরে দলবল নিয়ে হামলা ও মূর্তি ভাঙচুর করেন, মন্দির কমিটি মামলা করলে তাকে আটক করা হয়। কয়েকমাস আগে জামিন নিয়ে কারগার থেকে বেরিয়ে আসার পর তাকে আওয়ামি লিগ কমিটিতে প্রধান নেতৃত্বে আনা হয়। স্থানীয় হিন্দু নেতারা আতঙ্কে রয়েছেন। তারা আওয়ামি লিগের জেলা কমিটির নেতাদের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন, হামলার সময় করা ভিডিয়ো প্রদান করেছেন। কিন্তু বিষয়টিকে আমলই দেননি আওয়ামি লিগ নেতারা, হিন্দুদের আতঙ্ক তাদের উদ্বিগ্ন করেনি।

বিএনপির জন্মই পাকিস্তানি মূল্যবোধ ও ইসলামি চেতনা ধারণ করে। সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা গ্রহণ করে সংবিধানের ইসলামিকরণ করেন, মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামি-সহ যেসব ইসলামি দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে গণহত্যায় সহযোগিতা করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবেই বিএনপিকে সমর্থন করে না। আওয়ামি লিগ পাকিস্তানে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ায়। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ায়। হিন্দুরা আওয়ামি লিগকে সমর্থন করে, আওয়ামি লিগকে ভোট দেয়। হিন্দু নেতাদের অনেকে এখন অভিযোগ করছেন, আওয়ামি মনে করছে সংখ্যালঘুদের আওয়ামি লিগ ছাড়া বিকল্প নেই। তাই শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তির অভিশাপ থেকে হিন্দুরা মুক্ত হতে পারেনি। আওয়ামি লিগ আমলেও হামলা নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশত্যাগ বন্ধ হয়নি। সাংগঠনিকভাবে আওয়ামি লিগ ও তাদের অঙ্গ সংগঠনে সীমিত পর্যায়ে কিছু হিন্দুকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও নীতি নির্ধারণে তাদের কোনো ভূমিকা নেই।

ইসলামি সংগঠনগুলো কার্যত আওয়ামি লিগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে। তাদের হাতে রাখার জন্যে, পাশে পাওয়ার জন্যে চেষ্টার অন্ত নেই। এই প্রতিযোগিতায় সংখ্যালঘুদের কোনো অবস্থান নেই, যদিও তারা জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ। বিএনপি মনে করে সংখ্যালঘুদের কাছে টানলে ইসলামি শক্তি সঙ্গে থাকবে না। জাতীয় পার্টিও একই অবস্থানে। আওয়ামি লিগ মনে করে, সংখ্যালঘুরা সঙ্গে রয়েছে। ইসলামি শক্তিগুলোকে পাশে পেলে ক্ষমতার মসনদ স্থায়ী হবে। তাই আলেম-ওলামাদের তোয়াজ করাই ভালো।

এভাবেই ইসলামি দলগুলো, দলের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আলেম- ওলামাদের দাপট ক্রমেই বাড়ছে। তারা সবাই জানে, তাদের মাথার ওপর রয়েছে রাজনীতির ছায়া। এই ছায়া দীর্ঘস্থায়ী। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ভিত্তি দুর্বল হলেও ক্ষমতাই আসল। আর এই ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে পারেন আলেম-ওলামারা, জনগণ নয়। এই বিশ্বাস রাজনীতির ছায়াকে ক্রমেই বড়ো করছে। □

শব্দরূপ-৩ (বিষয় অভিমুখ—অনির্দিষ্ট) **অরুণ কুমার ঘোড়ই**

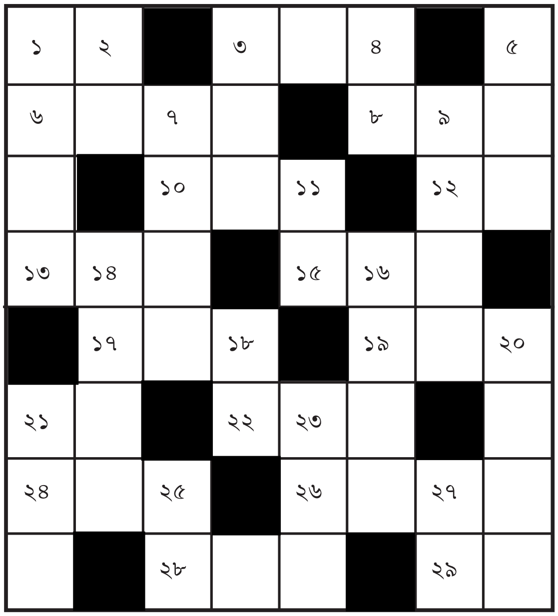

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. অন্ধকার রাত্রি খুঁজি,
৩. সরস ফল—আম্র বুঝি!
৬. ভক্তি যখন হরির উপর,
৮. 'বণিক' ধর, পাবে উত্তর।
১০. অন্য দিকে যখন মন,
১২. এবার তবে কর 'বর্জন'।
১৩. ঘরটি ভরাও 'রৌপ্য' দিয়ে
১৫. কালান্তক যম নাকি এ!
১৭. 'গভীরতা' মাপি নদীগর্ভে,
১৯. পর্বত গুহা দেখতে পাবে।
২১. বিনাশশীল...নশ্বর যা,
২২. তুলে ধর দৃষ্টান্তটা,
২৪. 'ন'-এর পরে কি যেন সে মৈত্রেয়ী দেবীর উপন্যাসে?
২৬. বন্দনার যোগ্য যিনি
২৮. জন্মদাতা পিতা ইনি
২৯. পক্ষ দু'টি, নেত্র ক'টি? দুই কক্ষে লেখ সেটি।

উপর-নীচ : ১. অহং ভাবখানা এ, **২.** মড়ক—শুনে মরছি ভয়ে! **৩.** রক্তবর্ণ...সে তো লাল-ই, **৪.** 'লইবে' যখন কথ্যে বলি। **৫.** কুম্ভমেলা এই স্থানেতেই, **৭.** ভবিষ্যতে যা ঘটবেই। **৯.** চৈতন্যদেবের এক ভক্তসঙ্গী, **১১.** ধ্বংস...বিনাশ-এর এর্থটি। **১৪.** ঘন সমাবেশ বহু মানুষের, **১৬.** ফুলের মধু—অর্থটি এর। **১৮.** সুরের বিস্তার—যা সংগীতে হয়, **২০.** বস্তুর উপাদান ও তার ধর্ম বিষয়। **২১.** মহান ব্যক্তির এই গুণ থাকে, **২৩.** বিম্বিসারের চিকিৎসক বলে জানি তাঁকে। **২৫.** দীপ্তি...আলো... বিক্রম—সবই, **২৭.** ধর্ম সঙ্গত বিধান-পাবি।

(● আগামী সংখ্যায় সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।)

প্রেরণার পাথেয়

হিন্দু সমাজকে নিজ হাতে নিজের কল্যাণ সাধনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলাই সঙ্ঘের কাজ। আমাদের এক অদ্ভুত অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে নিজেদের হিতাহিত চিন্তা না করিয়া আমরা অপরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ি। এই স্বভাবের পরিবর্তন না হইলে আমাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। হিন্দু সমাজের কল্যাণ করা মানে উহার নিজের রক্ষার দায়িত্ব নিজেকে পালন করিতে শিক্ষা দেওয়া।

* * *

আমরা কোনো নূতন কাজ করিতে চাহি না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে ভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির সেবা করিয়াছিলেন, যে আদর্শ তাঁহারা নিজেদের সামনে রাখিয়া ছিলেন এবং তাহার জন্য দিনরাত চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই আদর্শ অনুসরণকারী অনেক লোক যদি কোথাও একত্রিত হয় তবে সেখানে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে যাহা সংগঠনের পক্ষে অনুকূল। সমস্ত দেশে এইরূপ পবিত্র, শ্রদ্ধাপূর্ণ, ধ্যেয়নিষ্ঠার আদর্শে অনুপ্রাণিত, উৎসাহপ্রদ এবং নির্ভরশীল পরিবেশ গড়িয়া তোল। স্বয়ংসেবক যেখানে যাইবে সেখানেই সে যেন এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশ অটুট রাখিবার জন্য স্বয়ংসেবক যেন সব সময় চেষ্টা করে। এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাহাকে অটুট রাখার মনোবৃত্তি একবার জাগরিত হইলে আর কোনো কিছুতে সঙ্ঘ ভয় পাইবে না।

* * *

সঙ্ঘের কাজ ও তাহার বিচারধারা আমাদের কোনো নূতন আবিষ্কার নহে। সঙ্ঘ আমাদের পরম পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম, আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি, আমাদের স্বতঃসিদ্ধ হিন্দুরাষ্ট্র এবং অনাদি কাল হইতে প্রচিলিত পরম পবিত্র ভগবাধ্বজকে সেই একই রূপে সকলের সম্মুখে আনিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে নবচেতনা আনয়ন করিবার জন্য যে সময়ে যে কার্যপদ্ধতি প্রয়োজন তাহা সঙ্ঘ গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া অন্য কোনো নূতন কথা স্বীকার করিতে সঙ্ঘ প্রস্তুত নয়।

* * *

সঙ্ঘ কোনো ব্যক্তি বিশেষকে গুরুস্থানে না রাখিয়া পরম পবিত্র ভগবাধ্বজকেই গুরু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইহার কারণ ব্যক্তি যতই মহান হোক সে কখনও পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় হইতে পারে না। অতএব ব্যক্তি-বিশেষকে গুরু হিসাবে স্বীকার না করিয়া আমরা সেই জয়িষ্ণু ও প্রভাবশালী ভগবাধ্বজকে গুরু হিসাবে স্বীকার করিয়াছি—যাহার মধ্যে আমাদের ইতিহাস, পরম্পরা এবং রাষ্ট্রের জন্য স্বার্থ-ত্যাগের কথা এবং রাষ্ট্রীয়ত্বের সমস্ত মূল কথার সমন্বয় হইয়াছে। এই ভগবাধ্বজ হইতে আমরা যে উৎসাহ পাই তাহা কোনো মানুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত উৎসাহ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

('ডাক্তারজীর বাণী' পুস্তিকা থেকে গৃহীত)